ভবঘুরের চিঠি

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবঘুরের চিঠি

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৩

প্রকাশক : গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
১৪৫বি সাউথ সিঁথি রোড
কলিকাতা-২।

মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
অন্নদা মুন্সী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ও ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ

বাঁধাই : দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কাস
১০১ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯।

বিক্রয়কেন্দ্র : পুথিঘর
২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

এই গ্রন্থের রচনাগুলি 'মাসিক বসুমতী' এবং 'দৈনিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারে সাংবাদিক শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

—প্রকাশক।

—উপেন্দ্রনাথের অন্যান্য বই

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

ঊনপঞ্চাশী

স্বাধীন মানুষ

পথের সন্ধান

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম

সিনফিন

অনন্তানন্দের পত্র

বর্ত্তমান সমস্যা

জাতের বিড়ম্বনা

॥ ১ ॥

ভায়া,

সময় মত চিঠি দিতে পারি না বলে রাগ করেছ। কোথায় থাকি, কোথায় যাই, কোথায় শুই, কোথায় খাই—কিছুরই ঠিক নেই! তারপর, দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে যে নিশ্চিন্ত হয়ে কয়েকটা ছত্র লিখবো, সে রকম মন নিয়েও জন্মাই নি। যাই হোক, এবার ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় মজার ব্যাপার দেখলুম। যাচ্ছি গুজরাতে, বরদা রাজ্যে। রেলগাড়ীতে জনকতক গুজরাতী ব্রাহ্মণ, কয়েক জন মারাঠী আর বাকি হিন্দুস্থানী। একা আমিই সবেধন নীলমণি বাঙ্গালী। গাড়ীতে বেশ গল্প জমে এসেছে। একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ মালা জপতে জপতে শোনাচ্ছিলেন যে, তাঁর ছেলে না ভাইপো গায়কবাড়ের রাজ্যের একজন মস্ত বড় অফিসার। মালার একটি দানা দেখিয়ে বললেন যে, সেটি আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ। এক গির্ণার পাহাড় ছাড়া সে রকমটি আর ভূ-ভারতে অন্য কোথাও পাবার জো নেই। এমনি তার মাহাত্ম্য যে, সেটি ধরে এক লক্ষ বার শিবমন্ত্র জপ করলেই হয় মহাদেব, না হয় নন্দী, অভাব পক্ষে মহাদেবের বাহন ষাঁড়টি এসে হাজির হবেনই হবেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন

যে, অযোধ্যাজীতে হনুমান দাস বাবাজীর আখড়ায় ঠিক ঐ রকম আর একটি রুদ্রাক্ষ আছে। বাবাজী না কি তীর্থভ্রমণ করতে করতে আবু পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে বাবাজীর সেবায় তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ ঠাকুরের এক চেলা বাবাজীকে সেই রুদ্রাক্ষটি বকশিশ করেন। প্রতি সোমবার আর শুক্রবার পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে রুদ্রাক্ষটির পূজা করতে হয়। আর তার এমনি মহিমা যে, যদি কোন ছোটজাত সেটিকে চোখে দেখে তো চৌদ্দ দিন, না হয় চৌদ্দ মাস, খুব জোর চৌদ্দ বৎসরের মধ্যেই সে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে!

পাশেই একজন গুজরাতী উর্দ্ধনেত্র হয়ে গুন্ গুন্ করে ভজন গান করছিলেন। হিন্দুস্থানীর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বল্লেন—"দেখলে! তবু আজকালকার লোকে ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিশ্বাস করতে চায় না!"

গাড়ী সেই সময় একটা ষ্টেশনে এসে লাগতেই ছেঁড়া কাপড় পরা একটি জীর্ণ শীর্ণ লোক গাড়ীতে ঢুকে চুপ করে এক পাশে দাঁড়াল। আমাদের মালাধারী গুজরাতী পুরুষ তাকে নিজের ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলেন বুঝতে পারলুম না। বেচারা উত্তর করলে—"মাড়।" তারপর ভোজবাজীর মতো যে অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটলো, তা' না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু'জন গুজরাতী তড়াক করে লাফিয়ে একেবারে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়লেন। তাঁদের মাথার পাগড়ীগুলো

গড়াতে গড়াতে আরও পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে গেল। যিনি ভজন গাইছিলেন তাঁর ভক্তির উৎস একদম বন্ধ হয়ে গেল। "আরে রাম!" বলে হুঙ্কার করেই তিনি পাশের কামরায় টপ্‌কে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর দলও গাড়ী খালি কোরে যে যেদিকে পারলে অন্য গাড়ীতে পালালো।

যে লোকটি গাড়ীর এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপার কি?" লোকটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্‌লে—"বাবাজী, আমি মাড়।" তখন মনে পড়ে গেল যে বোম্বাই অঞ্চলে মাড়েরা অস্পৃশ্য জাতি। তাই বেচারা গাড়ীতে উঠতেই সবাই আপনার জাত আর ধর্ম্ম বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল। কোথায় গির্ণার, কোথায় আবু পর্ব্বত ঘুরে ঘুরে ধার্ম্মিকেরা যা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন, আজ একটা অস্পৃশ্য মাড়ের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তা' তো আর নষ্ট করতে পারেন না। মাড় বেচারাটাকে টেনে নিয়ে আমার কাছে বসাতে দেখে ধার্ম্মিকেরা আমার দিকে এমনি দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন যেন এইমাত্র আমি চিড়িয়াখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।

সেদিন আমার চোখের সুমুখ থেকে একটা পর্দ্দা সরে গেল। ছেলেবেলা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ার সময় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কাছে এসেই বিধাতার উপর আমার ভারি রাগ হতো। কেবলই মনে হতো, ওদিন পাঠানেরা না জিতে যদি মারাঠারা জিততো। আজ কিন্তু

মাড়ের দুর্দ্দশা দেখে মনে হলো, পাণিপথে মারাঠারা জিতলে ভারতে বর্গীদের রাজ্য হতো বটে, কিন্তু তা' হলে আজ এই ক'জন ধার্ম্মিক পুরুষ মিলে মাড় বেচারাকে ধাক্কা মেরে গাড়ী থেকে ফেলে দিতো। ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীও তার সুবিচার করতেন কি না সন্দেহ।

আর এ রোগ কি শুধু বর্গীদের? বাংলা, মাদ্রাজ, হিন্দুস্থান—এক চেয়ে আর সরেস। এ ব'লে আমায় দেখ্, ও ব'লে আমায় দেখ্। আলমোড়ায় এক সাধুদের মঠে একবার বসে আছি, এমন সময় এক পাদরী সাহেব তাঁর কতকগুলি দেশী-শিষ্য সমেত সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে একটি চোদ্দ-পনেরো বৎসরের ছেলে ছিল। সে যে কি মোহে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে, তা' জানবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হলো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করলুম—"বাবা তোমার বাড়ীতে কি মা-বাপ নেই? তুমি ধর্ম্মের কি বুঝেছ যে হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যা বলে ছাড়তে গেলে?" ছেলেটি একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—"ধর্ম্মের আমি কিছুই জানিনে। আমার মা-বাপই আমাকে খ্রীষ্টান করে দিয়েছে। প্রায় বছর দুই হলো আমি একবার বড়দিনের সময় পাদরী সাহেবদের আড্ডায় বেড়াতে যাই। পাদরী সাহেবরা আমায় আদর করে খাবার খেতে দেন। খেয়ে দেয়ে আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বল্লুম—মা, আমি পাদরী সাহেবদের বাড়ী খানা

খেয়ে এসেছি। মা শুনে কাঁদতে লাগলেন। বাবা বল্‌লেন,—আমার না কি ধৰ্ম্ম চলে গেছে। কাজেই আমায় আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে আর যাই কোথায়? সেই অবধি পাদরী সাহেবদের সঙ্গেই আছি।”

দেশাচারের ভয়ে যে সমাজে মা-বাপের মন থেকেও দয়া মায়া স্নেহমমতা শুকিয়ে গেছে, সে সমাজ সজীব না মরা? মরা বল্‌লে আমার বন্ধুরা চোটে যান। বলেন যে, সমাজকে অমন ব্যাং-খোঁচানি না ক'রে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করতে হয়। তাঁরা এ কথা ভেবে দেখেন না যে, যাদুর গায়ে হাত বুলোবার সময় আর নেই। এ তো বুদ্ধির অভাব নয়, এ যে প্রাণের অভাব। যারা জ্ঞানপাপী তাদের বুঝিয়ে কিছু হবে না। দুঃখ-যন্ত্রণার তাপে গলিয়ে তাদের নূতন ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। পুরানো বচনের বনিয়াদ উপড়ে ফেলে সত্য-সনাতন ধর্ম্মের নূতন সমাজ গড়তে হ'বে। এখন যা আছে সে তো ধৰ্ম্ম নয়, ধর্ম্মের ভ্যাংচানি। নিজেদের ক্ষুদে ক্ষুদে স্বার্থের পুঁটুলির উপর বড় বড় নামের ছাপ মেরে ধর্ম্মের বাজারে ভাল মাল বলে চালান করবার চেষ্টা। হায় রে! ভগবানই কি এমনই বোকা যে, দুটো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তাই যদি হতো তো এই হাজার বছর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে ক্রমাগত গুঁতো-বৃষ্টি

হচ্ছে কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো, কৃমির মতো বুকে হেঁটে মরছি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্যে কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্যে মেঠাই-মোণ্ডার ব্যবস্থা করে দেবেন, একথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপার পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না!

আমাদের দেশের ছেলেরা তাই দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। যে সব আচার অনুষ্ঠান সনাতন ধর্ম্মের মুখোস পরে আমাদের বুকের উপর বসে গলা টিপে দম বন্ধ করবার যোগাড় করে তুলেছে, সেগুলির মধ্যে যে সনাতনত্বের একান্ত অভাব, একথা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে। ধর্ম্ম যে শুধু কতকগুলো মরা আচারের অনুষ্ঠানমাত্র নয়, সাড়ে সতের কাহন কড়ি দিয়ে যে তা' ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মের চাপে মানুষের যে আধমরা বা আড়ষ্ট হয়ে উঠা একান্ত আবশ্যক নয়, একথা যতদিন না লোকে বুঝবে ততদিন আমাদের জীবনে যে কেমন করে ধর্ম্ম ফুটে উঠবে তা' তো বুঝতে পারিনে। পদি পিসির ধর্ম্ম দিয়ে যাঁরা ছেলেদের পেট ভরাতে চান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে যাঁরা অস্বাভাবিকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেন, শূদ্রস্পৃষ্ট হলে যাঁরা ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে তবে জাতে তুলে নেন, তাঁরা

যে ধর্ম্মমন্দিরের পাহারাওয়ালার ব্যবসা সহজে ছাড়বেন, তা' তো মনে হয় না! তবে আশা এই, ভগবানের একটি নাম দর্পহারী। মানুষ আপনার চারি দিকে যে অহঙ্কারের বেড়া দিয়ে রেখেছে, একদিন না একদিন তিনি তা' ভেঙ্গে উপড়ে ফেলে দেবেন। সারা জগৎ জুড়ে ভাঙ্গনের মড়মড়ানি শোনা যাচ্ছে। শুধু কি আমাদের দেশটাই বাদ পড়বে?

যা' জরাজীর্ণ, যা' ভাঙ্গবে, তাকে জোর করে ধরে রাখবে কে? তাই আমি মহাকালের উদ্দেশে প্রণাম করে বলি—

"ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন-ভরা চরণ।"

ভাদ্র, ১৩৫২

॥ ২ ॥

ভায়া,

বর্ণাশ্রম এদেশে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে—মহাত্মাজীর এই কথা শুনে তুমি চিন্তিত হয়ে পড়েছ, আর এই কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছ যে, চার বর্ণ ভগবান সৃষ্টি করেছেন একথা যদি সত্য হয়, তা' হলে সে ব্যবস্থা তো চিরস্থায়ী হবার কথা! সেটা আবার লোপ পাবে কি ক'রে?

একটা ভুল করেছ, ভায়া। ভগবান যখন চার বর্ণ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন তখন শুধু এদেশের কথা বলেন নি। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ রয়েছে, আর সেই প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে মানুষকে যে চার ভাগে ভাগ করা যায়, এই কথাটা বলাই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং শূদ্র ভিন্ন আপাততঃ আমাদের দেশে অন্য কোন বর্ণের অস্তিত্ব নেই, একথা যদি সত্যই হয়, তা' হলেও বর্ণ-বিভাগের সনাতনত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না। জগৎ থেকে যে ব্রাহ্মণ লোপ পেয়ে যায় নি, তার প্রমাণ মহাত্মাজী নিজে। ক্ষত্রিয় যে লোপ পায় নি, এত বড় যুদ্ধের পরও কি তা প্রমাণ করতে হবে? আর এই ক্ষত্রিয়রা যাদের তাঁবেদারী করে কাটাকাটি মারামারি করে বেড়াচ্ছে, তারা যে একবারে পাকা বৈশ্য তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

তা' হলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই—এ দেশে যে সমাজটাকে আমরা সনাতন ধর্ম্মীদের সমাজ বলে বড়াই করে বেড়াচ্ছি, আসলে সেটা কি ? সেটা কি শুধু শূদ্রদের সমাজ ? যদি চোটে না যাও, ভাই, তো বলি—আমার মনে হয় সেটা জীবন্ত মানুষের সমাজ নয়—জড়ের সমাজ। জড়ের লক্ষণই এই যে, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে নিজেকে পরিবর্ত্তন করতে পারে না ; কোন জিনিষ আত্মসাৎ করে নিজেকে পুষ্ট করবার শক্তিও তার নেই ; আত্মরক্ষা করতেও সে অসমর্থ। সে শুধু যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকতে জানে।

সনাতন আদর্শে সমাজ গড়বার চেষ্টা আমাদের দেশেই হয়েছিল ; কিন্তু দেশ পরাধীন হবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে সে আদর্শ কাজে পরিণত করবার শক্তি আমাদের লোপ পেয়েছে। আজ সনাতন সমাজ ব'লে যিনি আড়ষ্ট হয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছেন, এই হাজার বৎসর ধরে তিনি আত্মরক্ষার খাতিরেও নিজেকে আর বিশেষ পরিবর্ত্তন করতে পারেন নি। মোগল আর পাঠানদের আক্রমণ থেকে যাঁরা সমাজকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তা' করতে হয়েছে। নানক, কবীর, নিত্যানন্দ সকলেরই ঐ এক অবস্থা। সমাজ রক্ষণ আর পরিবর্ত্তনের ভার যাঁদের উপর, সেই ব্রাহ্মণ সমাজ এ সব নূতন সম্প্রদায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখেন নি।

অথচ সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুসলমানরা গ্রাস করতে লাগলো, তাদের রক্ষা করবারও কোন চেষ্টা এঁরা করেন নি। সমাজরক্ষকেরা তখন দরজায় খিল দিয়ে ব্যবস্থা দিলেন যে মুসলমানকে ছুঁলে জাত যাবে। কিন্তু ক্রমাগত পিছে-হটা আর পালানো ভিন্ন যাঁরা আত্মরক্ষার অন্য উপায় খুঁজে না পান, পৃথিবীতে তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যে শিখ জাতি না জন্মালে পাঞ্জাবে হিন্দুর নাম লোপ পেয়ে যেত, হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের হাত থেকেও জল খেতে সঙ্কুচিত। পাছে জাতটি মারা যায়।

আমাদের বাংলা দেশেই দেখ না—আদিশূর, বল্লাল সেন আর রঘুনন্দন সমাজকে যে ছাঁচে ঢেলে গেলেন, আমাদের টোলের পণ্ডিত মশায়েরা প্রাণপণে সেই ছাঁচখানি আঁকড়ে বসে আছেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই নাকি তাঁদের সনাতন ধর্ম্মের প্রাণটুকু ফুস করে বেরিয়ে যাবে! অথচ সে যুগে লোকে সমাজে সনাতন আদর্শ অনুযায়ী নূতন নূতন পরিবর্ত্তন করতে অত আঁতকে উঠতো না। শুধু অতীতের দিকে চেয়েই তারা দিন কাটাতো না।

ধর্ম্ম জিনিষটা সনাতন ব'লে কি সমাজের গঠনটিকেও সনাতন হতে হবে? সমাজের পরিবর্ত্তন যদি এত বড় মহাপাতক, তা' হলে উনিশ জন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উনিশখানা ধর্ম্মসংহিতা লিখতে গিয়েছিলেন কেন, আর রঘুনন্দনেরই বা নূতন করে স্মৃতি লেখবার দরকার কি ছিল?

বর্ণাশ্রমের আদর্শে যে সমাজের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম্ম পালন করাতে করাতে মানুষের মধ্যে শেষে পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব ফোটান। সকলের মধ্যে লুপ্ত মহাশক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে ভগবানের লীলাকেন্দ্রে পরিণত ক'রে, মানুষের জন্ম সার্থক করানো। জন্মের গুণে যারা ব্রাহ্মণ, আর জন্মের দোষে যারা শূদ্র বলে গণ্য, তাদের পৃথক পৃথক গণ্ডির মধ্যে পূরে রেখে আজ কি সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে ?

ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল ব'লে পরশুরাম নূতন ব্রাহ্মণ সমাজ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পুরাতন ক্ষত্রিয়বংশ যখন নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়েছিল, তখন বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করে সমাজ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সমাজের আদর্শটা বেশ পরিস্ফুট ছিল বলেই, ধর্ম্ম জিনিষটা সমাজ বন্ধনের চাপে মারা যায় নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। গাছের যতদিন প্রাণশক্তি থাকে, ততদিনই তাতে নব বসন্তে নূতন নূতন ফল, ফুল, পাতা গজায়। মরা গাছটা শুধু ভূতের ভয় দেখবার জন্য আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

আমাদের সমাজও আজ বহুকাল ধরে তেমনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বৎসর আগে যারা শূদ্র ছিল, আজও তারা শূদ্রই রয়ে গেছে। স্বামী রামদাস সেই শূদ্রদের ভিতর সুপ্ত ক্ষাত্র-তেজ ফুৎকার দিয়ে যা' একটু জাগিয়েছিলেন, তা' এক ঝট্‌কাতেই নিভে গেল। বৈশ্যরা যে

দেশ-বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করবে, পণ্ডিত মশায়েরা সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার পথও রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। আর তাঁরা নিজের গুরুগিরির ব্যবসা করে দু' পয়সা রোজগার করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। দলাদলি আর জাত-মারামারি ক'রে তাঁদের আর ব্রহ্মচিন্তার বড় বেশী অবসর থাকে না।

বাঁধনের উপর বাঁধন চড়িয়ে অতীতের গঠনটাকে পূরামাত্রায় বজায় রাখতে পাবলেই কি সমাজ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো? মানুষের মধ্যে যদি তার অন্তরাত্মাই প্রবুদ্ধ হয়ে না উঠলো, তা'হলে কতকগুলা ছাই-ভস্ম অর্থহীন আচারের বাঁধনে তাকে বেঁধে বেঁধে কি শুভ ফল ফল্‌বে? মানুষের জন্যই সমাজ। সমাজের ভিতরে থেকে যতক্ষণ মানুষের উন্নতি, ততক্ষণই সমাজের সার্থকতা। আর তাই যদি না হয়, তো বৃথা এই জড় সমাজের গোলামী করে কি হবে?

যাঁরা সমাজকে বহু শৃঙ্খলে বেঁধে মানুষের অন্তরস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করেন, তাঁরা সমাজের প্রকৃত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভগবানকে ভুলে যাঁরা সামাজিক বাঁধনকেই বড় করে দেখেন, তাঁদের শুধু অপদেবতারই পূজা করা হয়। সেটা কৃত্রিমতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বিকৃতি।

কতকটা স্মৃতি আর কতকটা দেশাচার মিলে যে সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে তারই মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি আর খেয়াল। সুতরাং সেই ব্যবস্থাগুলি সাময়িক

ও অস্থায়ী। তাদের টেনে টেনে লম্বা ক'রে চার যুগ জুড়ে রাখলে চল্‌বে কেন ?

প্রকৃত জীবনের পথ দেখিয়ে দেন শ্রুতি। সেই সনাতন আর অপৌরুষের শ্রুতিকে অপসারিত করে যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থাকেই জীবনের নিয়ন্তা করে ফেলেন, কোন একটা সাময়িক শাস্ত্রকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে স্থির করেন, তাঁদের জড় হয়ে যেতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না।

আর হয়েছেও তাই। আমাদের অবনতির প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা মানুষকে ছোট ক'রে সমাজকে বড় ক'রে রেখেছি ; দেবতার মন্দিরটি মার্ব্বেল-পাথর দিয়ে বাঁধাতে বাঁধাতে পূজার আয়োজন করতে ভুলে গেছি। দেবতাও কোন্ অবসরে মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন ; আর সেই মার্ব্বেল পাথর গুলো খসে গিয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছে।

এক দল বলছেন, বিলাতী-সিমেণ্ট দিয়ে বাইরে থেকে একটু জীর্ণ সংস্কার ক'রে দিলেই মন্দিরের কাজ চলে যাবে। আমাদের এ কালের সমাজ-সংস্কারকেরা গত পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরে সেই চেষ্টাই করছেন। তা' সে বিষয় নিয়ে আমাদের স্মৃতি-পঞ্চাননদের সঙ্গে তাঁরা বিচার করতে থাকুন। আমার কিন্তু মনে হয়, মন্দিরের ভিতরে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে পূজার ব্যবস্থা না করতে পারলে, চামচিকের দল মন্দিরের ভিতরেই বাসা বেঁধে

থাকবে। আর তাহলে মন্দিরের ভক্ত সমাগমও হ'বে না, বাহিরের জীর্ণ সংস্কার করবার লোকও পাওয়া যাবে না।

শুধু বাহিরের বাঁধন দিয়ে যাঁরা সমাজকে এক করতে গেছেন, তাঁরা কোন কালেই একটা বিরাট, প্রাণহীন জড়তা ছাড়া আর কিছুই গড়ে তুলতে পারেন নি। সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ঐক্যও থাকে না; আর অবাধ উন্নতির জন্য যে স্বাধীনতা দরকার, তা'ও নষ্ট হয়।

যাঁর আশ্রয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, সব মানুষই যাঁর কোলে এক, যাঁকে জগতে অভিব্যক্ত করবার জন্যই মানুষের কর্ম্মপ্রবাহ চলেছে, সেই ভগবানকেই ছেড়ে দিলে সব যজ্ঞের আয়োজনই পণ্ড হবে। আদর্শ সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত সেই ভগবানের বাহন—জগন্নাথের যাত্রার রথ। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, ঐক্য—এই রথেরই চারটি চাকা।

আমাদের সামাজিক রথখানি যে চাকা ভেঙ্গে, রাস্তা জুড়ে অচল হয়ে পড়ে আছে, তার কারণ এখানি সমাজের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর অহংকারের বাহনমাত্র। কর্ত্তাদের এমন শক্তি নেই যে তাদের চালান, এমন প্রেম নেই যে তাদের আপনার ক'রে লন। যাদের অপাংক্তেয় অতি শূদ্র ব'লে কর্ত্তারা আপনাদের শ্রীঅঙ্গের এক শত হাতের মধ্যে ঘেঁষতে দেন না, তাদের উপর গোলামীর ছাপ ভগবান্ মেরেছেন না মানুষ মেরেছে?

ভয় পেয়ো না ভাই! এই বুড়ো বয়সে গোলদীঘির

ধারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সমাজ-সংস্কার করবার দুরভিসন্ধি আমার একটুও নেই। ভগবানের নাম করে মানুষ যে চিরদিনই মানুষের উপর অত্যাচার করে আসছে, তা' আমি বেশ জানি। ভগবান এতদিন তা' দেখে হাসতেন কি কাঁদতেন, তা' জানিনে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে ক্রোধাগ্নি তাঁর চোখের কোণে আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখার মতো ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলে উঠছে। মানুষের মনে একদিন সে আগুন লাগবেই লাগবে। কত স্বার্থের পুঁটুলি, কত বুজরুকির ঝুলি, কত ওস্তাদের কত একচেটে স্বত্ব যে সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আমি তাই ভেবেই এখন থেকে শিউরে উঠছি আর মনে হচ্ছে আমাদের ঘরের কর্ত্তাদেরও বলি—"ওগো দিন থাকতে তোমরাও ঘর সামলাও। যিনি দর্পহারী, তিনি হয়তো তোমাদেরও খাতির করবেন না।"

আশ্বিন, ১৩৫২

॥ ৩ ॥

ভায়া,

এতদিন কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছিলাম তাই জানতে চেয়েছ। সে অনেক কথা। সবটা বুঝিয়ে বল্‌তে পারবো কি না জানিনে। একেবারে প্রাণের ভিতরকার সুখ-দুঃখের কথা কাগজে-কলমে ফুটিয়ে তোলা বড় শক্ত। শরৎ চাটুয্যের প্রাণ আর শরৎ চাটুয্যের কলম যদি চুরি করতে পারতুম, তা' হলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম।

তোমরা যেদিন খদ্দর পরে মাথায় গান্ধী-টুপি এঁটে মোটরে চড়ে রিষড়ায় কুলিদের কাছে চাঁদা আদায় আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ ও ত্যাগধর্ম্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়েছিলে, সে দিনটা মনে পড়ে? ফেরবার মুখে তোমরা যখন কেল্‌নরের দোকান থেকে এক-এক গ্লাস বরফ আর লিমনেড খেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলে, তখন আমি ষ্টেশনের বাইরে এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলুম। একে গরম তায় ধুলো! মেজাজটা যে খুব ঠিক ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। তার উপর তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের সংকীর্ত্তন যে আমার কোন কালেই বরদাস্ত হয় না, তা তো বিলক্ষণই জান।

কিন্তু থাক্ সে কথা। চুপ করে তোমাদের ত্যাগধর্ম্মের

বহরটা দেখে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পকেটটাতে একটু টান পড়তেই পিছন ফিরে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে আমার পকেটের রুমালখানা নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট দিচ্ছে। ছেলেটা তো আমার মতো শিল্ড-ম্যাচে ফরওয়ার্ড হয়ে খেলে নি! আমার সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? ধরা পড়তেই একেবারে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেল্‌লে। বলে কি না—"ভুখা হ্যায়।"

"বেটা আমার!—ভুখা হ্যায়।" বোলেই আমি ধাঁ করে একটা চড় কষিয়ে দিলুম। বলা নেই, কওয়া নেই—ছেলেটা লোটন পায়রার মতো লুটতে লুটতে পড়ে গেল।

তোমরা ত্যাগ ধর্ম সেরে ফিরে এলে। আমার আর ফেরা হলো না। কি মনে হতে লাগল জানিনে। ছেলেটার কাছে চুপ করে বসলুম। মরে গেলো নাকি ছোঁড়া! না, বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, ধুক্ ধুক্ করছে।

* * *

ঝম্-ঝম করে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটি গাছতলায় এসে দাঁড়ালুম। মুখে বৃষ্টির ছাঁট লেগেই হোক আর যে কারণেই হোক, সেই সময় সে চোখ খুলে মিট-মিট করে চাইছে। বারো-তেরো বছরের ছেলে হবে, কিন্তু হাল্‌কা যেন সোলা। বুকের পাঁজরগুলো এক-একখানা করে গোণা যায়। মাথায় ভিজে সপ্‌সপে চুলগুলো মুখ-চোখের উপর পড়েছিল।

সেগুলো সরিয়ে দিতে দেখলুম, ছুটো বেশ ডাগর ডাগর চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখের চাহনিতে তখনও ভয়-মাখানো।

—"মাৎ মারো, বাবুজী, মাৎ মারো।"

—"না রে না, মারবো না, তোর বাড়ী কোথা ?"

উর্দ্ধমুখ রাক্ষসের মতো কলগুলো যেখানে চিমনি মাথায় দাঁড়িয়েছিল, ছেলেটা হাত বাড়িয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে। আমি বললুম—"চল, তোকে বাড়ী রেখে আসি।"

তাদের বাড়ীর কাছে যখন এসে পৌঁছুলুম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ীই বটে! চারটে বাঁশের খুঁটির উপর একখানা গোলপাতার চালা। তিন দিক দরমা দিয়ে ঘেরা, আর এক দিকে একখানা ছেড়া চট ঝুলছে। সুমুখে একটু দাওয়া; তার উপরের চালা আধখানা ভেঙ্গে পড়েছে। দাওয়ার এক কোণে একখানা ভাঙ্গা শিল, আর আধখানা নোড়া। কি খানিকটা বাটনা বাটা হয়েছিল; তার অর্দ্ধেকটা জলে ধুয়ে মেঝের কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। ঘরের কোণে একটা খুঁটির সঙ্গে পা-বাঁধা একটি বছর খানেকের মেয়ে খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাতে-মুখে কাদা মাখছে; আর তারই কাছে একখানা ছেঁড়া মাছুরের উপর খান-ছুই জরাজীর্ণ কাঁথা মুড়ি দিয়ে কে এক জন পড়ে আছে।

ছেলেটা ঘরের দরজার কাছ থেকে ডাক্‌লে—"মায়ী।"

মায়ীর সাড়াও নেই, শব্দও নেই! ছেলেটা তাড়াতাড়ি তার মায়ের মুখের উপর থেকে কাঁথাখানা সরিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখলে। তারপর মায়ের বুকের উপর পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

* * *

কেন জানিনে, কিন্তু সেখান থেকে চোঁচা দৌড় দিলুম। পোয়াটাক পথ ছুটে এসে যখন গঙ্গার ধারে পড়লুম, তখনও আমার গা কাঁপছে! কপালে পিল্ পিল করে ঘাম বেরুচ্ছে। পকেট থেকে রুমালখানা বার করতে গিয়ে রুমালে-বাঁধা টাকাটা হাতে ঠেকলো। ছেলেটার গালে চড় মেরে ঐ টাকাটা কেড়ে নিয়েছিলুম। উঃ!

ছুঁড়ে টাকাটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম।

ভদ্রলোকের পোষাক আমার গায়ে কামড়াচ্ছিল। সেগুলো খুলে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বল্লুম—ব্যস্!

চুপ করে থাকতে পারলুম না। আবার সেই গোলপাতার কুঁড়ের কাছে আস্তে আস্তে ফিরে গেলুম, উঁকি মেরে দেখলুম ছেলেটি উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে আছে। আস্তে আস্তে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলুম—'ভেইয়া'।

সেই জীর্ণ-শীর্ণ অপরিচিত ছেলেটি আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'ভেইয়া!'

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। তারপর যখন আরও

দুই-তিন জন কলের কুলিকে ডেকে তার মায়ের সৎকার করে ফিরলুম, তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে গেছে। মনে হলো মনের অন্ধকারও যেন অনেকখানি কেটে গেছে।

*　　*　　*

ঠিক করলুম এবার ছোটলোক হতে হবে। ভদ্রলোকের উপর অরুচি ধরে গেছে। ভদ্রলোক মানে একটা জামা, একখানা উড়ুনি আর একজোড়া জুতো বৈ তো নয়। তা থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? তা ছাড়া আমার মা-কুলে মাসী নেই, বাপ-কুলে পিসি নেই, যে খোঁজ করতে আসবে! আমার ভেইয়ারও সংসারে আর কেউ নেই। বাপ কলে কাজ করতো। একদিন কাজ করতে গিয়ে আর ফিরলো না। কেউ বল্‌লে, গুর্খা পুলিসের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল, সে খুন হয়ে গেছে। কেউ বললে, জলে ডুবে মরেছে। মোট কথা, সে আর ফিরে এলো না। তার মাকে আট মাসের মেয়ে কোলে করে কুলি-লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে যে রোগটা তাকে ধরেছিল, তা বেড়েই চল্‌লো। ভেইয়া কলে চাকরী করতে গিয়েছিল; কিন্তু সর্দ্দারেরা সেলামী চায়। কোথায় পাবে সে সেলামী? তাই ভেইয়া কখন কখন ভিক্ষা করতো; আর কখন কখন লোকের পকেটে হাত পুরে দিত।

সকাল বেলা ভেইয়াকে বল্‌লুম—"কুছ পরোয়া নেহি!

ডরো মাৎ। তুই খুকিকে নিয়ে বসে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি।"

তারপর একখানা ছেড়া কাপড় পরে সর্দ্দারজীকে একটু তোয়াজ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম। যখন ফিরলুম তখন সতের সিকে হপ্তা হিসেবে একটা মজুরী বাগিয়ে ফেলেছি। ভারি ফূর্ত্তি হলো। কলকাতার মেসের ভাত খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় "বঙ্গ আমার, জননী আমার" বলে অনেক আর্ত্তনাদ করে বেড়িয়েছি। বঙ্গ-জননীর আসল চেহারাটা এইবার দেখতে পাবো, এই আশা এতদিনে মিটবে মনে হলো। গোলপাতার চালার ভিতর ছেঁড়া মাদুরে বসে ভেইয়াকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ভেইয়া রাঁধতে পারবি? ডাল আর ভাত, আর মূলো ভাতে?"

ভেইয়া জিজ্ঞাসা করলে—"আর খুকি?"

—"খুকি? ও! তাও তো বটে! কুছ পরোয়া নেহি। খুকি খাবে ফেন আর ডালের ঝোল।"

* * *

দু' বছর পরে ভেইয়াকে আমার চাকরীতে ভর্ত্তি করে দিয়ে চলে এসেছি। খুকির পেটে ফেন আর ডালের ঝোল সইল না। সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে।

তুমি চিঠিখানা পড়ে কি ভাবছ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মাথা একটুও খারাপ হয় নি। এই দু'বছরে বুঝতে পেরেছি ইউরোপে বল্‌শেভিকদের জন্ম হলো কেন? আর

সেই সঙ্গে বুঝেছি; তোমাদের সৌখীন স্বদেশ-হিতৈষীরা এদেশকে কস্মিন্‌কালেও নাড়াতে পারবে না!

যাক্, বক্তৃতা দেবার প্রবৃত্তি নেই। দেখা হলে সব কথা খুলে বল্‌বো।

কার্ত্তিক, ১৩৫২

॥ ৪ ॥

ভায়া,

গতবারের চিঠিখানা পড়েই তুমি ঠাট্টা স্থুরু করে দিয়েছ—ভেবেছ আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছি! কিন্তু তোমার রসিকতা মাঠে মারা গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই কম। তাদের মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানি তার সবটুকু যে সত্য, তা আমার মোটেই মনে হয় না। তবে তাদের গোড়াকার কথাটা যে খুবই খাঁটি, তাতে আর ভুল নেই।

কথাটা এই যে, পশ্চিম-ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে গণতন্ত্রের যে ঢক্কানিনাদ শোনা যাচ্ছে, সেটা মেকি মাল! পার্লামেণ্টের ফাঁদ পেতে, সকলকে এক-একটা ভোট দিয়ে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বা কল-কারখানা করে যারা হাতে বেশ দু'পয়সা জমিয়েছে, আইন-কানুন গড়বার ক্ষমতা তাদেরই হাতে। শাসনযন্ত্র তারাই চালায়, সন্ধি-বিগ্রহ তারাই করে ও আন্তর্জ্জাতিক সভা-সমিতি ডেকে তারাই মোড়লী করে। যাদের পয়সা নেই, তাদের কেতাবী-স্বাধীনতা থাকতে পারে, কিন্তু সে স্বাধীনতায় পেট ভরে না, দুঃখ ঘোচে না।

এই দুঃখের চাপে, পেটের জ্বালায় সাধারণ লোক অতিষ্ঠ

হয়ে উঠেছে। সব দেশেই তারা শাসনযন্ত্রটা অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার অপরাধ এই যে, সে কাজটা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই ইউরোপ আর আমেরিকার মোড়লের দল চারি দিক্ থেকে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও চীৎকারে যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটা যে সব সময় বেশ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি, তা' নয়!

আমাদের দেশে ঐ জিনিষটা এখনও ষোল আনা এসে পড়ে নি; তবে ক্রমশঃ এসে পড়াও বিচিত্র নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই এখনও পার্লামেণ্টের স্বপ্ন দেখছেন তা' জানি। কিন্তু তার কারণ শুধু এই যে, তাঁরা প্রধানতঃ ইংরেজের লেখা ইতিহাস আর অর্থশাস্ত্র পড়ে রাজনীতি শিখেছেন, আর জানই তো, ইংরেজের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের ইতিহাস একেবারে জড়ানো। তাঁদের ধারণা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ যখন পার্লামেণ্ট পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তখন আমরাও এই রকম একটা কিছু পেলে বেশ গুছিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়াটা অত সোজা বলে মনে হয় না। ইংল্যাণ্ডের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তারাই সেখানকার অভিজাত শ্রেণীকে মেরে ধরে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের হাতেই রাজ্য চালাবার ক্ষমতা এখনও পর্য্যন্ত

রয়েছে। তারা শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, এ দেশেরও হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা যখন আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে আসে, তখন মোগল রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। দেশের শাসনভার তখন ছোটখাট রাজা-রাজড়াদের উপর। সে সমস্ত রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে দেশের লোকের বড় একটা নাড়ীর যোগ ছিল না। তাই এদেশের লোকের সাহায্য নিয়েই সে সমস্ত রাজা-রাজড়াকে হটিয়ে দেওয়া ইংরেজের পক্ষে বিশেষ শক্ত হয় নি। এত বড় দেশকে কি করে জয় করে ফেললুম! একথা ভেবে ইংরেজ মাঝে মাঝে নিজের বাহুবলের খুব তারিফ করে থাকেন ; কিন্তু এটাতে অবাক্ হবার বিশেষ কিছু নেই। তখন ভারতবর্ষে যে শাসন-প্রণালী ছিল সেটা Feudal system. ইংরেজের সংঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধাক্কায় সেটা ভেঙ্গে গেল। এদেশের তখন যেরূপ অবস্থা, তাতে একটা প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি। তা' যদি পারত, তা' হলে ভারতবর্ষ অধিকার করা ইংরেজের পক্ষে অত সোজা ব্যাপার হোত না! দীপশিখা নিবে যাবার আগে যেমন একবার জ্বলে ওঠে, ১৮৫৭ সালে Feudal ভারতও তেমনি একবার জ্বলে উঠেছিল।

তারপর বর্ত্তমান ভারতের আরম্ভ। ইংরেজের আমলে দেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, কংগ্রেস প্রধানতঃ তাদেরই সৃষ্টি। যারা ইংরেজের রাজত্বকালে ধনবান হয়ে উঠেছেন, ইংরেজের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার ইচ্ছা ও

কল্পনা তাঁদেরই মনে জেগে উঠেছে। জমিদার বলো আর উকিল-ব্যারিষ্টারই বলো, আর বোম্বাই-আমেদাবাদের কলওয়ালাই বলো, সবই ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি। ইংরেজের ক্ষুরে এদের মাথা মুড়ানো। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শাসক সম্প্রদায়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে রকম, এঁদেরও অনেকটা তাই। এঁরা মুখে যে স্বাধীনতার কথা বলেন, সেটার সোজা বাংলা মানে হচ্ছে এই যে, ইংরেজের বদলে এঁরা এদেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার চান।

কিন্তু কল-কারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা জমিদারী চালিয়ে যেখানে দশ জন ধনবান হয়েছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ দশ হাজার জন দরিদ্র হয়েছে। এই সব দরিদ্রের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তারা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সুহৃদ নয়, তা' বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত লোক যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, সেদিন থেকে এই কথাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদের স্বার্থে আর ধনবানদের স্বার্থে অনেকটা বিরোধ আছে। সেই দিন থেকে Moderates and Extremists-এর সৃষ্টি। যারা ধনবান তারা সহজে গোলমালের মধ্যে বা অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাইবে না। নিজেদের ধন-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তিটা একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই তারা ষোল আনা বিদেশী শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী হয়ে উঠবে আর হচ্ছেও তাই। কংগ্রেসের এক দল যে মাঝে মাঝে negotiation

and conciliation-এর কথা বলেন, এইটাই হচ্ছে তার নির্গলিতার্থ। আজ যারা Nationalism-এর পতাকা তুলেছে, সরকারী বা আধা সরকারী চাকরীর বাজার যদি একটু সস্তা হয়ে যায়, তাহলে এ দল থেকেও অনেক-লোক ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে সৌখীন Nationalism-এর পিছনে একটা পেটের জ্বালার Nationalism লুকিয়ে আছে। তার সন্ধান পেয়ে জাতীয় দলের অনেক নেতা এখন থেকেই আঁতকে উঠেছেন। অথচ সেটা একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। দেশের অন্ততঃ বারো আনা লোকই দীন, হীন, কাঙ্গাল। দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে এই সর্ব্বস্বান্ত, দরিদ্রদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। দেশ স্বাধীন না হলে তাদের দুঃখ ঘোচে না; সুতরাং তারা মাঝ রাস্তায় ভেঙ্গে পড়বে না। ঘুষ দিয়ে তাদের ভোলান যাবে না।

সেদিন আমার একজন তথাকথিত সনাতনী বন্ধু বলছিলেন—"এরা তো শূদ্র। এদের হাতে রাজশক্তি গিয়ে পড়লে সেটা তো শূদ্র-রাজ্য হয়ে পড়বে! আর শূদ্ররাজ্য তো ভারতের আদর্শ নয়। ওটা একেবারে Bolshevik ব্যাপার।"

কথাটা মিথ্যা বলেই আমার ধারণা। Bolshevikরা কি চায়, তা আমি জানিনে; কিন্তু আমি যা চাই সেটা খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই

যে, যারা শরীর বা মন দিয়ে পরিশ্রম করে অন্ন সংস্থান করে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাই তাদের অন্তর্গত। যারা পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে নিজেদের পেট ভরাতে চায়, সমাজে তাদের স্থান নেই। তাদের স্থান হওয়া উচিত জেলখানায়। শাস্ত্রমতে তারা ব্রাহ্মণও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, শূদ্রও নয়। তারা অপাংক্তেয়, বেদ বাহ্য।

খাঁটি ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা Aristocracy বা Bourgeois দলভুক্ত নন; তাঁরা এই proletariat-এর মাথা, এদের শিক্ষাগুরু। ব্রাহ্মণের কাজ এদের শিক্ষিত, সমর্থ, সংঘবদ্ধ করে তোলা। আজকাল যারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নামে পরিচিত, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়ও নয়, বৈশ্যও নয়। তারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের শাস্ত্রীয় আদর্শ মানে না। তারা নিজেদের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। সমাজকে তারা রক্ষাও করে না, ভরণ-পোষণও করে না। তাদের ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী।

আজ-কাল আমাদের দেশে Nationalist বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা লম্বা লম্বা বুলি ঝেড়ে আসর জমাচ্ছেন, খাঁটি nationalism-এর ধাক্কায় তাঁরা ভেঙ্গে-চুরে যাবেনই। যারা অর্থ চায়, প্রতিপত্তি চায়, বচন দিয়ে কাজ সারতে চায়, তারা আর বেশীদিন টিঁকতে পারবে না। যারা সমাজকে ঐশ্বর্য্য বা আভিজাত্যের চাপে দাবিয়ে রাখতে চায়, তারা সমগ্র সমাজের মঙ্গল না দেখে শুধু নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চায়।

যারা স্বাধীনতাকে চায়, তাদের ঐ লাঞ্ছিত দীন-দরিদ্রের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আর তাদের মাঝখানে নূতন ব্রাহ্মণ, নূতন ক্ষত্রিয়, নূতন বৈশ্য সৃষ্টি করে তুলতে হবে। এই নূতন সমাজ গড়ে তোলবার ভার যারা নেবে, তারই এযুগের ব্রাহ্মণ। তাদের নির্লোভ হওয়া চাই,—সমাজের মঙ্গলের জন্যে তাদের সর্ব্বত্যাগী হওয়া চাই।

ঠিক এরকম সমাজ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে গড়ে ওঠে নি, কিন্তু এইটাই যে এদেশের ধর্ম্ম, শাস্ত্রকারদের আদর্শ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরকম সমাজ গড়ে তোলা যাঁদের লক্ষ্য ছিল, তাঁরাই সমাজের শাসন-ক্ষমতা জ্ঞানী নির্লোভ ব্রাহ্মণের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁরা শুধু জন্মের গুণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে পরিচিত, তাঁরা এ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন; কিন্তু আদর্শটা এদেশে বেঁচে আছে। এ দেশ শুধু লাঠির শাসন বা টাকার শাসন মানবে না। টাকা বা লাঠি যদি ব্রাহ্মণের অনুগত না হয় তা' হলে এদেশে তা' চলবে না। এই আদর্শের নামে যারা দেশকে ডাক দেবে, তারাই দেশের আদর্শ গড়বে। তারাই সমগ্র সমাজের সংহত শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে স্বাধীনতা আনবে।

তোমার Aristocracy বা Barristocracy কেন যে সন্দেহের চক্ষে দেখি, কেন যে শুধু মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া আদর্শে আমার মন ভরে না, কেন যে গরীবের উপর ঝোঁক দিই, তা হয়ত বুঝেছ। এটা খাঁটি এদেশী আদর্শ, বিদেশ

থেকে আমদানি করা মাল নয়। তোমরা ইংরেজের পুঁথি পড়ে, যে স্বরাজের আদর্শ আমদানি করছ, সে ইউরোপের পচা democracy! ইউরোপের অঙ্গ থেকেই তা' খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

থাকগে! চিঠিখানা ক্রমশঃ যে বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করছে। সুতরাং আজ এইখানেই ইতি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

॥ ৫ ॥

ভায়া,

অহিংসার জোরে সত্যি সত্যিই শত্রুর হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করা যায় কি না, একথা অনেক দিন থেকেই ভাবছি; আর এতদিন পরে তার একটা সদুত্তর পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। এতদিন মহাত্মাজীর অহিংসা-তত্ত্বের যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা ব্যাপারটার গূঢ় তাৎপর্য্য ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেদিন দেখেছিলাম একজন নবীন ভাষ্যকার লিখেছেন—"বিরুদ্ধ শক্তি যদি দেখে, জনগণ মরবে তবু মারবে না, তখন তাদের নিপীড়নের উগ্রতা কিছু কমে আসবে।··· হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভাবে তাদের অস্ত্রের মুষ্টি শিথিল হবে, হৃদয়ে চমক লাগবে। ক্ষণিকের জন্য হয়ত থেমে তারা ভাববে, জনগণ তা' হলে কী চায়? তখন জনসাধারণের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে এসে, কথা বলে নিজেদের দাবি কত ন্যায়সঙ্গত তাই বুঝিয়ে বলবে। সকলের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনার প্রস্তাব করবে এবং শাসিত ও শাসক উভয়ে মিলে নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।"

অতি সরল পন্থা! লড়ালড়ির মারামারির বালাই নেই।

শুধু নিরস্ত্র হয়ে পড়ে পড়ে ঘা-কতক মার খেয়ে শাসকদের হৃদয়ে একটু চমক লাগিয়ে দিতে পারলেই কার্য্য হাঁসিল! তারপর বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাবে; জমিদারেরা তাঁদের লাঠিয়ালদের লাঠিগুলি ভেঙ্গে প্রজাদের জ্বালানি কাঠ তৈয়ার করতে লেগে যাবেন, বিড়লা-পার্কে কুলিদের জন্য অট্টালিকা উঠবে, পেথিক লরেন্স আর পণ্ডিত জওহরলাল দু'জনে মিলে স্বাধীন ভারতের খসড়া তৈয়ার করতে লেগে যাবেন······ইত্যাদি, ইত্যাদি। আহা, ভাবতেও সুখ আছে! কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান?—এমন শাসকও তো আছেন, যাঁদের হৃদয়গুলি এমন খাঁটি ইস্পাত দিয়ে মোড়া যে সেখানে কোন চমক লাগবার সম্ভাবনা নেই! এই দেখ না, রাজকোটে স্বয়ং মহাত্মাজী গিয়ে নিরম্বু-উপবাস করে পড়ে রইলেন; কিন্তু ঠাকুর-সাহেবের যে সে জন্যে আহার-নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটেছিল, ইতিহাসে তো সে-কথা লেখে না। মহাত্মাজী রিক্ত হস্তে ফিরে এসে বল্লেন—তাঁর দাওয়াই ঠিক; তবে তাঁর নিজের ভিতর কোথাও হয়তো প্রচ্ছন্ন ভাবে হিংসার বীজ লুকিয়ে ছিল বলে দাওয়াইটা লাগে নি। আজন্মকাল অহিংসা সাধন করে এই বুড়ো বয়সেও তিনি যদি ষোল আনা অহিংস না হয়ে থাকেন তা' হলে রাতারাতি যে দেশশুদ্ধ লোক অহিংসা-সিদ্ধ হয়ে উঠবে, এরকম কল্পনা করা কি ঠিক? বাংলা দেশের রাস্তা-ঘাটে হাজার হাজার লোককে পেটের জ্বালায় মরতে দেখে যে স্যার জন

হার্বার্ট বা তাঁর পেয়ারের মন্ত্রীরা দুঃখে নিজেদের আহারের মাত্রা কমিয়েছিলেন, সে রকম প্রমাণও তো পাওয়া যায় না!

তারপর, আর একটা কথা আছে। হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার অভিযান যখন আরম্ভ হবে, তখন দু'দলে মুখ দেখা-দেখি হলে, তবে তো শাসকদের প্রাণে চমক লাগবে। কিন্তু শাসকরা যদি ধরিত্রীর বক্ষে পা না দিয়ে দশ হাজার ফুট উপর থেকে আণবিক বোমা ছাড়েন, তা হলে নীচে নেমে এসে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অহিংসার অভিযান শূন্যে মিলিয়ে গেছে। দাবি-দাওয়া বা রফারফি সব প্রশ্নেরই এক তরফা মীমাংসা হয়ে গেছে। দু'দলে মিলে নূতন প্রতিষ্ঠান গড়বার কোন প্রয়োজনই হবে না।

এই সব ভেবে-চিন্তে আমার মনে হয় যে, অহিংসার চোটে শত্রুর হৃদয়ে চমক লাগাবার চেষ্টাটা অহিংসা সাধনের বা শত্রু বিজয়ের প্রকৃত পন্থা নয়। অনেক দিন আগে—প্রায় ৪০ বৎসর আগে এই শত্রুবিজয়ের পন্থা খুঁজতে খুঁজতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে পড়েছিলুম। একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর আখড়ায় আশ্রয় নিয়ে কিছুদিন থাকবার পর একদিন মনের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করে ফেললুম। সাধু মহারাজ আমার সব কথা শুনে বল্‌লেন—"বাবা, পৃথিবীটা তো হিংসায় ভরে গেছে; তোরা আবার রক্তারক্তি আরম্ভ করে দিয়ে যদি সেই হিংসার মাত্রা বাড়িয়ে তুলিস্ তা' হলে কি দেশের মঙ্গল হবে?" আমিও নাছোড়বান্দা। বল্‌লুম—"মহারাজ! কাঁটা দিয়ে কাঁটা

তোলার উপদেশ তো শাস্ত্রকারেরা দিয়ে গেছেন। পাষণ্ড-দলনের জন্যে যদি একটু আধটু বৈধ-হিংসার আয়োজন করা যায়, তা হলে সে পাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই ?" সাধু মহারাজ হেসে বল্লেন—"তুই বেটা একটি বাস্তু-ঘুঘু। একটা খুনো-খুনি না করে তোরা ছাড়বি নে দেখতে পাচ্ছি! যা, যখন কাউকে মারবি, তখন গৌর বলে মারিস। গৌরহরির নাম করলে সব পাপ খণ্ডে যাবে" কথাটা আমার মনে বেশ লেগেছিল। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" বলে, দাও টপাং করে বন্দুকের ট্রিগার টেনে। তারপর যা হয় সামলে নেবেন গৌরহরি! হিংসার সঙ্গে অহিংসার সামঞ্জস্য বিধানের এই ব্যবস্থা নিয়ে আমি দেশে ফিরেছিলাম।

কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, গৌরহরি-পন্থাটা খাঁটি অহিংসা-পন্থা নয়। শত্রু-দমনের একটা খাঁটি অহিংসা-পন্থা সত্য সত্যই আছে। আর তার আবিষ্কর্তা আমাদের পল্টু।

পল্টুকে তুমি চেনো তো ? সেই পল্টু হে, যে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে তিনটে গোরার নাক থেকে তিন সের রক্ত বের করে দিয়েছিল! অনেকদিন তার খবর পাই নি। কেউ বলতো সে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গিয়ে সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে; কেউ বলতো না, মেদিনীপুরের গণ্ডগোলের পর সরকার বাহাদুর তাকে বক্সার জেলে আটক করে রেখেছেন। ভগবান্ জানেন

কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যা! কিন্তু সেদিন মহাত্মাজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে সোদপুরে গিয়ে দেখি, মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভার এক কোণে গায়ে মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে হাত জোড় করে চক্ষু বুজে বসে আছে আমাদের পল্টু!

মহাত্মাজীর সাতকুল উদ্ধার না করে যে জল গ্রহণ করতো না, সেই পল্টু যে আজ খদ্দর এঁটে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভায় যোগ দেবে—এ যে স্বপ্নের অগোচর! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! পল্টুর দিকে নজর রাখতে রাখতে মহাত্মাজী যে কি বল্‌লেন, তা' আর আমার ভাল করে শোনা হলো না। সভা ভঙ্গ হলে তাড়াতাড়ি আমি পল্টুর কাছে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি রে পল্টু! তুই এখানে?"

পল্টু অতি বিনীত ভাবে আমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বল্‌লে—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ কি রে! তুই কি সত্যি সত্যিই মহাত্মাজীর অহিংসা-দলে ভর্ত্তি হলি না কি? কোথায় গেল তোর খাকির হাফ-প্যান্ট? কোথায় গেল তোর খেঁটে-লাঠি? তোর কোন অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

পল্টু হেসে বল্‌লে—"আজ্ঞে না; আগে এই নশ্বর দেহের ওজন ছিল দু'শো পাউণ্ড; সেদিন সোদপুর ষ্টেশনে ওজন হয়ে দেখলুম, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ওজন গিয়ে দাঁড়িয়েছে দু'শো চল্লিশ পাউণ্ডে। খেতে পেলে তা হজমেরও কোন ব্যাঘাত হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“তুই এতদিন ছিলি কোথা, পল্টু?”

পল্টু বল্‌লে—“থাকবো আর কোথায়? ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে। নানা তীর্থস্থানে সাধু সন্দর্শন করে বেড়াচ্ছিলুম। শুনলুম মহাত্মাজী আসছেন সোদপুরে। মনে করলুম—যাই একবার মহাপুরুষকে দর্শন করে পাপ-তাপ ক্ষালন করে আসি। আর ঐ সঙ্গে তাঁর অহিংসা-সাধনের কসরতটা যদি আদায় করতে পারি তো মন্দ কি? রাজকোটের ব্যাপারের পর থেকেই আমার মনে মনে খট্‌কা ছিল যে, মহাত্মাজীর সাধন-প্রণালীর ভিতর হয় তো কোথাও একটু ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি যে কোথায়, এবারে তা ধরতে পেরেছি।”

আমি হাঁ করে পল্টুর কথা শুনছিলুম। ছোঁড়া বলে কি! ও যে আবার মহাত্মার উপর Super-মহাত্মা হয়ে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞাসা করলুম—“মহাত্মাজীর সাধনের ত্রুটি কি দেখ্‌লি?”

পল্টু বল্‌লে—“মহাত্মাজীর অহিংসা ও ঠিক, প্রার্থনা-প্রণালীও ঠিক। কিন্তু যে রকম আসন করে বসে প্রার্থনা কর্‌লে শত্রুর মনে সহজে অহিংসার উদ্রেক হয়, সেই আসনটা তিনি এখনও রপ্ত করতে পারেন নি।”

পল্টুর কি শেষে মাথা খারাপ হলো! আমি আর

অহিংসার কথা তুললুম না। দু'জনে আস্তে আস্তে সোদপুর ষ্টেশনের দিকে আসতে লাগলুম। কাছাকাছি এসে দেখি দুর্ভেদ্য ভিড়। প্রায় শ'দুই-তিন লোক জমা হয়েছে। বিশাল দুই বাহু দিয়ে ভিড় ঠেলে পল্টু ভিতরে ঢুকে পড়লো। আমিও পিছু পিছু গেলুম। গিয়ে দেখি রাস্তার ধারে একটা মেয়ে পড়ে পড়ে গোঁ-গোঁ করছে। দুই-একজন তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর অদূরে গোঁফ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লাল-পাগড়ীওয়ালা কন্‌স্‌টেবল। শোনা গেল, কন্‌স্‌টেবল সাহেব ভিড় সরাতে গিয়ে ব্যাটন চালিয়েছিলেন, আর সেই শান্তি রক্ষার প্রয়াসের ফলে মেয়েটি রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পল্টু তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে কোলে করে ভিড়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে দু'জনকে বল্‌লে—"একে আগলাও আর মুখ-চোখে জল দাও ; এখানে ভিড় জমতে দিও না।" তারপর আস্তে আস্তে কন্‌স্‌টেবল সাহেবের সুমুখে গিয়ে বল্‌লে—"দেখি, বাবা, তোমার ব্যাটনটা।"

কন্‌স্‌টেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে পল্টুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পল্টু বল্‌লে—"দেখ বাবা, ওটা হিংসাত্মক জিনিষ ; হাতে রাখা ভাল নয়। ওটাকে ফেলে দাও, আর যা করেছ তার জন্যে অনুতপ্ত হও।"

কিন্তু দেখা গেল কন্‌স্‌টেবল সাহেব অনুতপ্ত না হয়ে তপ্ত

হয়ে উঠলেন। পল্টুকে এক ধাক্কা মেরে বল্লেন—"হট্ যাও।"

পল্টুর দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের কলেবর সে ধাক্কায় নড়লো না। কিন্তু দেখতে দেখতে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, তা যেমন অহিংস তেমনি অপূর্ব্ব। পল্টু চক্ষের নিমিষে কন্স্টেবলের হাত থেকে ব্যাটনটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠ্লো—"বল্ কৈ, ভি চলে।" তারপর তার একটি ঠ্যাং আর একটি হাত ধরে আস্তে আস্তে রাস্তার উপর তাকে শুইয়ে দিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে তার পেটের উপর বসে প্রার্থনা স্থুরু করে দিলে—

"হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কন্স্টেবল বাবুটির হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার কর।

(পেটের উপর এক দমক)

হে দয়াময় ভগবান্! এর মোহ কাটিয়ে দাও; দাও এর মনে স্থবুদ্ধি।"

(পেটের উপর আর এক দমক)

মিনিট তিন-চার এই রকম প্রার্থনা আর দমকের পরে দেখা গেল, কন্স্টেবল বেচারীর মুখ নীলাভ হয়ে উঠেছে; তার গোঁফজোড়া ঝুলে পড়েছে, আর তার গলার ভিতর থেকে একটা অস্ফুট ধ্বনি বের হচ্ছে, যা প্রার্থনাও হতে পারে, গোঙ্গানিও হতে পারে।

আমি দেখলুম—সর্ব্বনাশ! পল্টু আবার বুঝি একটা খুনের দায়ে পড়ে!

পল্টুর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কন্‌স্‌টেবলের পেট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে সে মেয়েটি যেখানে শুয়েছিল সেইখানে গেল। দেখলে মেয়েটি সামলে উঠেছে। ফিরে এসে আমায় বল্‌লে—"চলুন, আজ আপনার ওখানেই থাকবো মনে করছি।"

আমি দ্বিরুক্তি না করে পল্টুর সেই অহিংসা-সাধনার পীঠস্থান থেকে সরে পড়লুম। কিছু দূর গিয়ে পল্টু বল্‌লে —"দেখলেন তো, ঠিক আসন করে বসতে পারলে অহিংসা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই হবে। আসনটি হওয়া চাই—একেবারে মূলাধার চক্রের ঠিক উপরে।"

পৌষ, ১৩৫২

॥ ৬ ॥

ভায়া,

সেই পুরানো প্রশ্নটা আবার নূতন রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। লোকে আবার জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেছে—"কঃ পন্থা ?" মহাত্মাজী কাতর ভাবে বলছেন—"ও কথাটা আবার বারবার তুলে প্রাণে ব্যথা দাও কেন, বাবা ? অহিংসা ছাড়া যে স্বরাজে পৌঁছুবার আর কোন প্রকৃত রাস্তা নেই, সে কথা তো আমি বহু পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি।" শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি বলছেন—"আপনি তো রাস্তা বাত্‌লে দিয়েই খালাস, কিন্তু লোকে যে সে রাস্তায় চলছে না। হিংসা আর অহিংসার সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আপনিই মাথা ঘামাতে থাকুন। লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে মোটেই ব্যস্ত নয়। যেমন করে হোক্ স্বরাজ পেলেই হলো। স্বরাজ হিংসার পথ ধরে এলেন, কি অহিংসার পথ ধরে এলেন, লোকে সে কথা জানতেই চায় না।"

পুরুষের সঙ্গে তর্কের সময় ধমক দেওয়া চলে, কিন্তু শ্রীমতী একে মহিলা, তায় মুখরা ; কাজেই তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার সময় মহাত্মাদেরও একটু হিসাব করে কথা কইতে হয়। মহাত্মাজী মহাব্যথিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—"আচ্ছা

মা অরুণা, একবার করুণা করে ভেবে দেখ দেখি, দেশে আজ যে এই জনজাগরণ হয়েছে, তা অহিংসা-সাধনার ফল কি না।”

শ্রীমতী একথার জবাব কি দেবেন, তা জানিনে। কিন্তু মহাত্মাজীর ভক্তেরা চারি দিক থেকেই সাড়া দিয়ে উঠেছেন। প্রায় সব খবরের কাগজওয়ালারাই মহাত্মাজীর কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠেছেন—“আহা, তা তো বটেই; তা তো বটেই। অহিংসা-মন্ত্রের চোটেই দেশ যে আজ জেগে উঠেছে, একথা যে না মেনে নেবে, দাও তার কণ্ঠী ছিঁড়ে।”

গলায় কণ্ঠী আমার নেই, কিন্তু কণ্ঠী না পেয়ে অহিংস ভাবে টুঁটি ছেঁড়বার প্রবৃত্তিটাও অস্বাভাবিক নয়! কাজেই দেশ কেন জেগে উঠেছে, সে সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করবার আগ্রহ আমার মোটেই নেই। তবে জনজাগরণের সঙ্গে অহিংসার যে কি রকম সম্বন্ধ, তা’ স্বচক্ষে দেখবার একবার সুযোগ ঘটেছিল।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। ছেলেরা তখন টপাটপ স্কুল-কলেজ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে অহিংস-অসহযোগের মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করতে লেগে গেছে। চাষাভুষোদের ভিতর কেউ রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর ছিল না, মা সরস্বতীর তারা বরপুত্র, কাজেই ইস্কুল-কলেজ ছাড়বার ধরবার কোন বালাই-ই তাদের ছিল না। বাকি খাজনা আদায়ের জন্যে জমিদারেরা নালিশ করলে তাদের মাঝে মাঝে আদালতের দিকে ছুটতে হতো বটে, কিন্তু সেদিকে

ঘেঁষবার বিশেষ আগ্রহ তাদের ছিল না। কাজেই ট্রিপল বয়কটের আন্দোলনটা গ্রামের চাষাভুষোদের ভিতর তেমন জমছিল না।

ছেলেদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ইংরেজ যে নৈবেদ্যের মাথায় মণ্ডার মতো আমাদের কাঁধে চেপে বসে আছে, আর নৈবেদ্যের চালগুলি সরিয়ে নিলেই যে তারা মাটির উপর গড়িয়ে পড়বে—একথা তারা প্রতিদিনই সভা-সমিতি ডেকে বেশ ওজস্বিনী ভাষায় বুঝিয়ে দিতো। কিন্তু নৈবেদ্যের মাথার মণ্ডাটিকে মাটিতে গড়িয়ে দেবার জন্যে চাষাভুষোদের যে কি করতে হবে, সে-কথা তাঁদের বক্তৃতার ভিতর বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতো না। মহাজন-জমিদারের গোমস্তা আর পুলিশের দারোগা বাবু—এঁদের নিয়েই তো চাষাভুষোদের জ্বালা—কিন্তু ওঁদের কথা তো বাবুরা কেউ বলেন না। চাষাভুষোরা বক্তৃতা শোনে, "আজ্ঞে হাঁ" বলে, আর চুপ করে বাড়ী ফিরে গিয়ে বলে—"বাবুদের সঙ্গে গবরমেণ্টের কি একটা নাকি ঝগড়া হয়েছে।"

তারপর একদিন খবর এলো, দাও চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করে। সেদিন চাষীদের ভিতর বেশ একটু উৎসাহ দেখতে পেলুম। ছেলেরা বক্তৃতা দেবার সময়ে তাদের বুঝিয়ে দিলে যে, স্বরাজ হয়ে গেলে তাদের চৌকিদারী ট্যাক্স কেন, জমিজমার খাজনাও আর দিতে হবে না। চাষীরা পরম উৎসাহে জিজ্ঞাসা করলে—"তাই নাকি, বাবু! আরে

সেকথা আগে বলেন নি কেন ?” তারপর দেখতে দেখতে চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চাষীরা বল্‌লে—“স্বরাজটা তো জিনিষ মন্দ নয়!” সে বৎসর ধান-চালও ভাল হয় নি। জমিজমার খাজনা অনেকেই সময় মতো দিতে পারে নি। তাই চাষীরা চুপি চুপি পরামর্শ কোরে ঠিক করলে— এখন থেকেই জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দিয়ে স্বরাজটাকে এগিয়ে আনা যাক। ছেলেরা বল্‌লে—“কুছ পরোয়া নেই। দাও বন্ধ করে।”

এদিকে যে সব জমিদাররা নবীন উৎসাহের ঝোঁকে কংগ্রেসের-খাতায় নাম লিখিয়ে অসহযোগী সেজেছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে, স্বরাজ বাঁকা পথ ধরে চলতে আরম্ভ করেছে। তাঁরা কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদের কাছে গিয়ে নালিশ করলেন, ছেলেরা চাষীদের ভুল পথে চালাতে আরম্ভ করেছে। উপর থেকে হুকুম এলো—“খবর্‌দার! জমিদারদের খাজনা বন্ধ করো না। তাতে শ্রেণী-বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে; আর শ্রেণী-বিরোধ অহিংসার বিরোধী।”

ছেলেরা কেউ গুঁইগাই করলে; কেউ বা চুপ করে রইলো, কিন্তু চাষীরা একবার স্বরাজের আস্বাদ পেয়ে আর তা’ সহজে ছাড়তে চাইলে না। এদিকে সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন—কংগ্রেসী-জমিদারদের কারও কারও সঙ্গে হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেখা হয়ে গেল, এবং দু’দিন পরেই কোথাকার একটি ডাকাতি-মামলার তদন্ত করতে পুলিশের

দারোগা বাবু সদলবলে গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হলেন। দেবতা সশরীরে উপস্থিত হলেই পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। হাস্যমুখে সে ভার নিলেন জমিদারের গোমস্তা মশাই। আর চাষীদের বাড়ী থেকে পাঁঠা, হাঁসের ডিম বিনামূল্যে সংগৃহীত হতে লাগলো। তারপর আরম্ভ হলো গ্রামে বাছবাছা চাষীদের দারোগা বাবুর সঙ্গে দেখা করবার ডাক আর সঙ্গে সঙ্গে চড়, চাপড় আর গুঁতো। সামন্তদের বাড়ীর একটি মেয়ে সন্ধ্যার সময় নদী থেকে জল আনবার সময় দারোগা বাবু নাকি তাকে কি একটা কথা বলেছিলেন, তা নিয়েও বেশ কানাকানি চলতে লাগলো।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় হরিমণ্ডলের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসে এইসব কথার আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় দেখি স্বয়ং দারোগা বাবু বেশ একটু তরল অবস্থায় হেলতে দুলতে দু'জন কন্‌স্‌টেবল সঙ্গে করে সেই পথ দিয়ে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করতে বেরিয়েছেন। তাঁকে দেখেই সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, হরি মণ্ডলের বড় ছেলে গোপাল একটু চাপা গলায় বল্‌লে—"ঐ যাচ্ছে শালা।" কথাটা দারোগা বাবুর কানে বোধ হয় পৌঁছেছিল। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। বিপদের সম্ভাবনা দেখে হরি মণ্ডল এগিয়ে গিয়ে দারোগা বাবুকে নমস্কার করে কুশল প্রশ্ন করলেন—"বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি, হুজুর?" কিন্তু হুজুরের মুখ মেঘাচ্ছন্ন। তিনি কন্‌স্‌টেবলদের হুকুম দিলেন—"বেঁধে নিয়ে চল শালাকে।"

হরি মণ্ডলের ছেলে লাফিয়ে এসে বল্‌লে—"খবর্‌দার! মুখ সামলে কথা বলবেন দারোগা বাবু।" দারোগা বাবুর হাতে ছিল ছড়ি। তিনি সপাং করে বসিয়ে দিলেন তা' একেবারে হরি মণ্ডলের ছেলের মুখের উপর।

পিল-পিল করে চারিদিক থেকে লোক জমা হয়ে গেল। গোবিন্দ বৈরাগীর ছেলে হলধর বল্‌লে—"বেশী ঘাঁটাবেন না, দারোগা বাবু। আমরা সব কংগ্রেসের লোক, জানেন?" দারোগা বল্‌লেন—"বটে! ওরে আমার কংগ্রেসের লোক। ভারি রস হয়েছে তোদের! শালারা আমার কংগ্রেসের লোক। বাঁধ্‌ শালাকে।"

গোবিন্দর মেজো ছেলেটা এতক্ষণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপার দেখছিলো। হঠাৎ পোঁ করে ছুটে গিয়ে সে কোথা থেকে একটা বাঁশের খুঁটি টেনে নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত। একবার চীৎকার করে বলে উঠলো—"বন্দেমাতরম্‌! গান্ধী মায়িকি জয়।" আর দেখতে দেখতে সেই খুঁটি গিয়ে পড়লো দারোগা বাবুর মাথার উপর।

রক্তাক্ত দেহে দারোগা বাবুর পতন ও মূর্চ্ছা; আর সঙ্গে সঙ্গে কন্‌স্‌টেবলদ্বয়ের চোঁচা দৌড়। গোবিন্দের মেজো ছেলেটাকে নিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে পড়লুম। রাস্তায় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হাঁরে, ঐ যে গান্ধী-মায়ের নাম করে লাঠি চালালি, ও আবার কে?

কোন নতুন দেবতা-টেবতা নাকি?” গোবিন্দর ছেলে আমার দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বল্‌লে—“আঃ পোড়া কপাল! হারু পণ্ডিত যখন লঙ্কাপ্রাসনের (Non-co-operation?) পুঁথি থেকে শোলোক পড়ে সেদিন সব বুঝিয়ে দিলে, তা' আপনি শোনেন নি বুঝি? গান্ধী মায়ি হোলো দুগ্‌গা মায়ি, কালী মায়িরই আর একটি নাম। রোজ একশো' আটবার তাঁর নাম জপ করলেই দু'মাসের মধ্যে ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাবে।”

* * *

কলকাতায় ফিরে এসে আমি এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ খবরের কাগজে পড়েছি। সব বিবরণগুলিই একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী নিজস্ব সংবাদদাতার লেখা। সেগুলির ভিতর বর্ত্তমান চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি, অপূর্ব্ব জন-জাগরণ, অহিংসার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল কথাই ছিল—ছিল না শুধু, গোপাল বৈরাগীর মেজো ছেলের হাতের বাঁশের খুঁটিটির কোন উল্লেখ। কাজেই আমিও ক্রমশঃ বিশ্বাস করবার চেষ্টা করতে লাগলুম যে, নিজের চক্ষে যা দেখেছিলুম তা' সব মায়া; আর অহিংসা মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতেই আসমুদ্র হিমাচল দুলে-দুলে উঠছে!

* * *

জানি আমি, তুমি অহিংসা মন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ সাধক; কিন্তু তুমি যে সত্যনিষ্ঠ, তাতেও সন্দেহ নেই।

জনজাগরণ বলতে যদি বোঝ পরাধীনতার জ্বালার অনুভূতি, তা'হলে সত্যি করে বলো দেখি, এর গোড়া কত দূরে? বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রাজনারায়ণ, যোগেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের লেখার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ নেই? ১৯০৫ সালে বাংলা দেশে যা হয়েছিল, তাকে জনজাগরণ বলতে বোধ হয় তোমার আপত্তি নেই? অসহযোগ কথাটার তখনও সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু যা হয়েছিল তা' অসহযোগের চূড়ান্ত। কিন্তু তার ভিতর তো অহিংসার কোন বালাই ছিল না। তারপর বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের ভিতর যারা তিল তিল করে মরেছে আর ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে তাদের দীর্ঘশ্বাস কি শূন্যে মিলিয়ে গেছে? জনসাধারণের মনে একটুও ছাপ রেখে যায় নি?

মহাত্মাজী যে অহিংসা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, তার ভিতর অহিংসা প্রভাব কতটুকু আর অসহযোগের প্রভাব বা কতটুকু? আমার তো মনে হয় যে, অসহযোগের ফলে যতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, অসহযোগের সঙ্গে অহিংসা জুড়ে দিয়ে সে চাঞ্চল্য দাবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চৌরিচৌরার পরে মহাত্মাজী যখন জোর করে অসহযোগ-আন্দোলনকে অহিংসার গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন সারা দেশ জুড়ে যে অবসাদ দেখা দিয়েছিল, তা' কি মনে পড়ে? কংগ্রেসের সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স এনকোয়ারী কমিটি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, পঞ্চনদ ঘুরে এসে স্থির

করেছিলেন যে, দেশের জনসাধারণ এখনও অসহযোগের জন্য প্রস্তুত হয় নি। কিন্তু যে সমস্ত তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করে-ছিলেন, তা দেখে মনে হয় যে দেশ ঠিক প্রস্তুত হয়েছিল—প্রস্তুত হন নি শুধু তাঁরা নিজে। পশ্চিম অঞ্চলে কৃষকদের ভিতর "ঐক্য" আন্দোলনের সময় ঐ একই কথা আবার প্রমাণ হয়েছিল। আর আজও চারি দিকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, আর নেতারা যে সমস্ত বিবৃতি দিচ্ছেন, তা' থেকে আমার তো বেশ স্পষ্টই মনে হয় যে, জনজাগরণ যখনই অসহযোগের রূপ নিয়ে তীব্র হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে, তখনই নেতারা ভীতচকিত চিত্তে তার উপর অহিংসার শান্তি-বারি ছড়িয়ে দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাকে হীনবল করবার চেষ্টা করেছেন। জনজাগরণের সঙ্গে অহিংসার কোন সম্বন্ধই আমি দেখতে পাচ্ছি না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, অসহযোগ যা' গড়েছে, অহিংসা তা' ভেঙ্গেছে।

এতক্ষণ 'জনজাগরণ' কথাটা ব্যবহার করছি; কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক তা' নয়। জনগণ জেগেছে কি শুধু রেগেছে, তা' এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা যে তাদের মনে প্রবল হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু যে পথে গেলে স্বাধীনতা পাবে তার একটা স্পষ্ট ধারণা তাদের হয়েছে কি না, তা' ঠিক ধরা যাচ্ছে না। যে পথের নির্দ্দেশ নেতারা মাঝে মাঝে দিচ্ছেন, তা'

স্বাধীনতার পথ, কি চিরপুরাতন মডারেট মনোবৃত্তিসম্পন্ন negotiation and conciliation-এর পথ, এ সম্বন্ধেও আমার মন থেকে সন্দেহ দূর হয় নি।

যাক্, পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। অতএব আজ এইখানেই রাম-নাম কীর্ত্তন করতে করতে অহিংসার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করা যাক।

ফাল্গুন, ১৩৫২

॥ ৭ ॥

দেখ ভাই,

আমাদের দেবতাদের মধ্যে কেষ্টঠাকুরই যে সকলের চেয়ে আমাদের মাঝখানে আসর জমিয়ে নিয়েছেন, তা'তে আর ভুল নেই। আমাদের শিবঠাকুর চিরকেলে বুড়ো। কখনও যে তিনি ছেলেমানুষ বা যুবাপুরুষ ছিলেন, তার প্রমাণ নেই। কাজেই তাকে আমরা ভক্তি করি, হয়তো একটু ভালও বাসি, কিন্তু পূজো দেবার সময় দিই আলোচাল আর কাঁচকলা। মা দুর্গা আমাদের গিন্নি-বান্নি মানুষ। ছেলে-পিলে নিয়ে যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন প্রণাম করে, আমরা তাঁর কাছে দুঃখ জানাই, তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, বিপদে আপদে তাঁর শরণাপন্ন হই; তাঁর সেবার আয়োজনও নিতান্ত মন্দ করিনে; কিন্তু তবু তাঁর সঙ্গে একটা দূরত্বের ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু কেষ্টঠাকুরটির বেলায় এ সব কোন কথাই আমাদের মনে আসে না। তাকে ছোট ছেলের মতন কোলে করে আদর করি, ননি-চোর বলে কান মলে দিই; পীতধড়া পরিয়ে মাঠে মাঠে গরু চরাতে পাঠিয়ে দিই, সে আমাদের কাছ থেকে যদি কিছু চুরি-চামারি না করে বা কেড়ে-বিকড়ে না খায়, আবদার করে যদি আমাদের ঘাড়ে না চড়ে তা' হলে সত্যিই কি আমাদের প্রাণে ব্যথা

লাগে না। কেষ্টঠাকুরের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে ইয়ারকি দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। অনায়াসেই তার কান ধরে আমরা শ্রীরাধিকার পায়ে দাসখত লিখিয়ে নিই; চন্দ্রাবলীর কথা তুলে তার সঙ্গে রসিকতা করি; বস্ত্র-হরণের প্রসঙ্গ তুলে আমরা তাকে লজ্‌জা দেবার চেষ্টা করি। কখনও মনে হয় না যে, আমরা একটা দেবতার অসম্মান করছি! কিছুতেই তার উপর রাগ হয় না তার ঐশ্বর্য্যের কথা যদি বা কখনও মনে পড়ে,তবুও তাতে আমাদের ভয় হয় না। কেষ্ট আমাদের একেবারে আপনার লোক।

আর একটা মজা দেখেছ? কেষ্টকে কখনও বুড়ো বলে কল্পনা করা যায় না। পুরাণে না-কি লেখা আছে যে, অতি বৃদ্ধ বয়সে জরা নামক ব্যাধের হাতে বাণবিদ্ধ হয়ে আমাদের কেষ্টঠাকুর বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সে কথা আমলেই আনি নে। কেষ্ট কখনও বুড়ো হয়! সে যে চিরকেলে ছোকরা। ধড়াচূড়ো পরে কদমতলায় বাঁশীই বাজাক, পাঁচনবাড়ি হাতে করে বৃন্দাবনের রাখালদের মাঝে সর্দ্দারী করুক, গোপীদের সঙ্গে নেচেই বেড়াক বা তাদের গায়ে পিচকারি দিয়ে তাদের লালে লালই করে দিক—আমাদের কেষ্টর ভিতর কোথাও বুড়োমি নেই। আজ বসন্তোৎসবের দিনে সেই কেষ্টর হোলি-খেলা।

আজ ভোর বেলা চুপ করে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, আর দূর থেকে হিন্দুস্থানী-গাড়োয়ানদের

ফাগুয়ার হল্লা আমার কানে ভেসে আসছে। কেষ্ট যে কেন এদেশের বসন্তোৎসবের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা' বেশ বুঝতে পারছি ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে যে হিন্দুস্থানীদের আমরা খোট্টাই বলি আর মেড়োই বলি, তারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পাকা হিন্দু। ওদের গড়নটা একটু মোটা তারের, আমাদের মতো সৌখীন ওরা নয় ; কিন্তু হিন্দুর সভ্যতা বলতে যা' বুঝি তা' ওদেরই মাঝখানে জন্মেছে ; আর ওদেরই রক্তমাংসে তা' পুষ্ট। তাই খাঁটি হিন্দুর আচার ব্যবহার ওদের মনকে যতটা নাড়াচাড়া দেয়, বাঙ্গালীর মনকে ততটা দেয় না। আর একটু বেলা হলেই ওরা গা-ময় আবীর মেখে মাদল বাজাতে বাজাতে রাস্তায় বার হয়ে পড়বে ; আর উন্মত্তের মতো চীৎকার করতে থাকবে—হোলি হৈ, হোলি হৈ ! আর আমরা তখন দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে চশমা এঁটে মৃদু-মৃদু হাসবো আর হয় তো ভাবতে থাকবো—এ পাগলের দল করে কি !

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে, যে আনন্দ মানবজীবনের গোড়ার কথা, সেই আনন্দ থেকেই এই উন্মাদনার উৎপত্তি। যেদিন ভারতবর্ষের যৌবন ছিল, সেদিন এই আনন্দ-স্রোত মানবজীবনের দুকূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হতো ; আর এই বসন্তোৎসবের সময়েই সেই জীবনস্রোতে বান ডাকতো। আমাদের কেষ্টঠাকুর এই জীবনানন্দের প্রতীক ছিলেন বলেই ক্রমশঃ তাঁকে আশ্রয় করেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত

হতে আরম্ভ হয়েছিল। আর প্রাচীন ব্রসন্তোৎসব ধীরে ধীরে দোলযাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

তারপর, কেন তা' জানি নে, এদেশে এই আনন্দের ধারা ক্ষীণ হতে আরম্ভ হলো! তুনিয়ার কাছে ঘা খেয়ে খেয়ে যাঁদের ভিতরের আনন্দ-স্রোত ক্রমাগত শুকিয়ে আসতে লাগলো, তাঁরা বুদ্ধির প্যাঁচ কষে কষে স্থির করলেন যে, মা ধরিত্রীর কোল মোটেই শান্তিপ্রদ স্থান নয়। তুঃখ জিনিষটা একেবারে মানুষের জীবনের গোড়ার সঙ্গে জড়িত, সুতরাং জীবনের গোড়া কেটে একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করতে না পারলে আর তুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা নেই। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বড় বড় সাধু-পুরুষেরা এই মহামৃত্যুর সাধনাই করে এসেছেন। ফল যা হয়েছে তা' চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ। আজ শক, হুন পারসী; কাল মোগল, পাঠান, তুর্ক; তার পরদিন পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সবাই এসে কঁ্যাৎ-কঁ্যাৎ করে আমাদের পিঠে লাথি কষিয়েছে, আর আমরা পরম প্রেম ভরে গান ধরেছি—'মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?'

আমাদের মহাপুরুষেরা কেউ বলেছেন ভক্তিতে মুক্তি, কেউ বলেছেন জ্ঞান-বিচারে মুক্তি। এই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়াই সকলের কাম্য। কি করলে মানুষের মতো বেঁচে থাকা যায়, সেটা চিন্তা করা কেউ প্রয়োজন মনে করেন নি।

সমাজের প্রাণশক্তি যেদিন থেকে ক্ষীণ হয়েছে, সেইদিন থেকেই রাজদণ্ড আমাদের হাত থেকে খসে পড়েছে; আর আমরা দুর্ব্বলতাকে বৈরাগ্যের রঙে রাঙিয়ে আধ্যাত্মিক অভিমানে ফুলে ওঠবার চেষ্টা করেছি!

আজ রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই আধ্যাত্মিক আত্মপ্রবঞ্চনা চলছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা না-কি অহিংসাত্মক-সত্যাগ্রহ নামক এমন একটা অদ্ভুত অস্ত্র বার করেছেন, যা প্রেমসে লাগাতে পারলে গোখরো সাপও কেঁচো হয়ে যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্য্যন্ত না-কি এই নবীন ব্রহ্মাস্ত্রের পরীক্ষা হয়ে গেছে; আর সর্ব্বত্রই না-কি তার অব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক-চক্ষু আমার নেই; কিন্তু এই চর্ম্ম-চক্ষু দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, এই ব্রহ্মাস্ত্রের ঘা খেয়েও জেনারেল স্মাটস এখনও দিব্যি বেঁচে আছেন: আর নেটাল-প্রবাসী ভারতীয়দের আগেও দুঃখ যেমন ছিল, এখনও ঠিক তাই-ই আছে। গত পঁচিশ বৎসর ধরে ভারতবর্ষে এই নবীন ব্রহ্মাস্ত্রের নানাবিধ কসরত দেখান হয়েছে, কিন্তু এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের ফলে শত্রুপক্ষ যে মিত্রপক্ষে পরিণত হয়েছে, বা অনুতপ্ত হয়ে শুকিয়ে গেছে তার তো কোন প্রমাণ পাই নে। তোমরা হয়ত বলবে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে তিন-তিনটে মন্ত্রীকে এদেশে পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করছেন, ওটা কিসের ফল? ও-কথা বলে যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পার তো তাতে আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু

মনে মনে আমি বল্‌বো—"কাক ম'লো ঝড়ে, আর প্যাঁচা বলে আমার শাপ লাগলো হাড়ে হাড়ে।"

আমার কি মনে হয়, জান? তোমাদের ঐ যে সত্যাগ্রহ, ওটা সেকালের মানভঞ্জন পালারই রকম ফের। যেখানে দু'জনের মধ্যে সম্বন্ধ শুধু ভালবাসার, সেইখানেই ঐ মান-ভঞ্জনের পালা গেয়ে সুফল পাওয়া যায়। তোমার কষ্ট দেখলে যার প্রাণ দুঃখে ছট্‌ফট্‌ করে, Self-inflicted Suffering দিয়ে শুধু তাকেই ঘায়েল করা যায়। ও অস্ত্র গার্হস্থ্য নীতিতে চলে, রাজনীতিতে নয়। আমাদের কেষ্টঠাকুর ঐ অস্ত্রটির ব্যবহার বেশ ভাল করেই জানতেন। অনেকবার তাঁকে বলতে হয়েছিল যে, মানিনীর মানভঞ্জন না হলে তিনি তাঁর বাঁশীটি ভেঙ্গে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবেন, আর গলায় পীত-ধড়া বেঁধে কদমগাছের ডালে ঝুলে পড়বেন। কিন্তু কখনও তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীমতীর মানভঞ্জন না হলে কঠোর অনশনব্রত অবলম্বন করে চারিদিকে ডাক্তার-কবিরাজের ভিড় লাগিয়ে একটা হৈ-চৈ আরম্ভ করবেন—তা তো কোথাও দেখতে পাই নে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি অহিংসার ভাণ করে একবার বলেছিলেন বটে যে অস্ত্র-ধারণ করবেন না। কিন্তু ভীষ্মের বাণে জর্জ্জরিত হয়ে অর্জ্জুন যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তখন রথের চাকা নিয়ে ভীষ্মকে তাড়া করে যেতেও তাঁর বিলম্ব হয় নি। নিরস্ত্র হয়ে যে যুদ্ধে সারথ্য করাও সম্ভব নয়, হয়তো তিনি সেইটাই দেখাতে চেয়েছিলেন।

আজ তাই কেষ্টঠাকুরের দোললীলার দিনে প্রার্থনা করি, এই শুঁটকে-তপস্বীর দলের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করো। এই ইহবিমুখ ভক্তি-আধ্যাত্মিকতার মোহ আমাদের কেটে যাক। ফ্যাকাসে রক্তের বদলে আমাদের শিরায় শিরায় আবার আবীরের মতো খাঁটি লাল রক্তের স্রোত বইতে থাকুক।

চৈত্র, ১৩৫২

॥ ৮ ॥

ভায়া,

তুমি জানতে চেয়েছো—হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি? এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়,—সমস্যার গোড়া হচ্ছে গোঁড়ামিতে, আর তার সমাধান হচ্ছে উদারতায়। যে শহরে আমার জন্ম সেখানে একটি ছোট মুসলমান পল্লী ছিল। জাতে তারা পাঁজারী। তাদের ছেলেরা আমাদের সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়তো, তাদের মেয়েরা আমাদের বাড়ী মাছ বিক্রি করতে আসত। আমাদের ধারণা ছিল, বামুন, কায়েত, তিলি, স্বুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি জাতের মতো মুসলমানেরা একটা জাত। সব জাতের ভিতরেই যেমন কতকগুলো বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার আছে, মুসলমানের ভিতরও তেমনি। সেই সব আচার-ব্যবহারের পার্থক্য থেকে কখনও মাথা ফাটাফাটি হতে দেখি নি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের কি মতভেদ, তা' নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। হিন্দুদের ভিতর তো অনেক রকমের দেব-দেবী আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মন্দিরে থাকেন। আর তাঁদের পূজার প্রকরণ আর উপকরণ যখন সবই আলাদা, তখন মুসলমানদের পূজার

স্থান আর পূজার প্রণালী যে আলাদা হবে—এ-ত খুবই স্বাভাবিক। এতে আপত্তি করবার কি আছে।

এই ছিল আমাদের ছেলেবেলার মনোভাব। তারপর একটু বড় হয়ে যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করলুম, তখন শুনলুম—যত মত তত পথ—সব সাধন-প্রণালীর গন্তব্যস্থান এক। আরও শুনলুম—পরমহংস দেব যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তেমনি মুসলমানের কাছে দীক্ষা নিয়ে মুসলমানীপন্থায় সাধন করেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, মুসলমান, খৃষ্টান—এঁদের বাইরের আচার-ব্যবহার আর সাধন-প্রণালীর মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক, এদের সকলেরই ধর্ম্ম যে এক মানবধর্ম্মেরই ভিন্ন ভিন্ন দিক—এ ধারণাটা আমাদের মনে ছেলেবেলা থেকেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের ভিতর কোথাও যে একটা জটিল সমস্যা আছে, তা' কখনও মনে হয় নি।

কিন্তু এই সমস্যার যে আর একটা দিক আছে তা' প্রথম টের পেয়েছিলুম পাঞ্জাবে গিয়ে। আর সে সমস্যাটা ধর্ম্মের আবরণে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করলেও আসলে যে সেটা রাজনৈতিক ব্যাপার, তা' বুঝতে দেরী হয় না। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াটা যে কি জিনিষ তা' পাঞ্জাবে না এলে ভাল করে বোঝা যায় না। মোগল-পাঠান সকলেরই ঠেলা সামলাতে হয়েছে পাঞ্জাবের হিন্দুকে। লাঠালাঠিটা

অনেকদিন ধরে চলেছে ; সুতরাং শত্রুতাও বেশ পাকাপাকি রকমের হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে বিদেশী মুসলমানদের বংশধরের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তার উপর কতকটা গোঁড়ামীর জন্যে আর কতকটা নিজেদের রাজত্বের ভিত্তি পাকা করবার জন্যে অনেক মুসলমান বাদশা জোর করে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল শিখ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই। এই বিজেতাদের প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবার চেষ্টা থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল ; আর শিখেদের হাতে যখন রাজশক্তি আসে, তখন এরা অতীত অত্যাচারের শোধ দিতেও ছাড়ে নি। পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধটা সেই অতীত ইতিহাসের জের।

শিখেরা, আর পরবর্ত্তীকালে আর্য্যসমাজীরা যদি পাঞ্জাবের মুসলমানদের শিখ বা আর্য্যসমাজী করে নিতে পারতো, তা' হলে আজ আর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা শুনতে পাওয়া যেত না। কিন্তু লাঠির জোরে বা culture-এর জোরে শিখ বা আর্য্যসমাজীরা তা' করতে পারে নি। শুধু culture-এর দিক থেকে দেখতে গেলে শিখ ধর্ম্মে আর মুসলমান ধর্ম্মে যে খুব বেশী তফাৎ আছে, তা' মনে হয় না। যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তাদের দোষ-গুণ অনেকটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। পাঞ্জাবে হিন্দুয়ানিকে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে শিখ ধর্ম্মের রূপ

নিতে হয়েছে। তাই শিখ ধর্ম্মের ভিতর মুসলমানদের দোষ-গুণ সবই অল্পবিস্তর এসে পড়েছে। গ্রন্থসাহেব আর কোরাণ, গুরুদ্বার আর মসজিদ, গুরু আর পয়গম্বর—এ সব আসলে প্রায় একই জিনিষ। তবে শিখদের জিনিষগুলো হচ্ছে এদেশী, আর মুসলমানদের জিনিষগুলো হচ্ছে বিদেশী; এক্ষেত্রে যাদের হাতে শক্তি তাদেরই জয় হয়। কিন্তু মোগল-পাঠানদের হাতে রাজশক্তি যতদিন ছিল, শিখদের হাতে ততদিন থাকে নি। কাজেই যে experiment-টা আরম্ভ হয়েছিল তা' শেষ হবার অবসর পায় নি। পাঞ্জাবে শিখ আর মুসলমান এখনও পরস্পরের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের cultural fusion-এর চেষ্টায় অনেক 'পন্থ'-এর আবির্ভাব হয়েছে। রাজশক্তি নিয়েও কতকটা কাড়াকাড়ি হয়েছে; কিন্তু হিন্দুরা তাতে জয়লাভ করতে পারে নি। মোগল-পাঠানের বংশধরেরা, শিষ্যেরা হিন্দু সমাজের খানিকটা খসিয়ে খসিয়ে নিয়েছে; আর হিন্দী ভাষার ঘাড়ে ফাঁসি চাপিয়ে একটা নূতন উর্দ্দু ভাষা আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা উর্দ্দু culture-এর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। দিল্লী আর লক্ষ্মৌ হচ্ছে এই culture-এর আড্ডা। খাঁটি মুসলমানেরা যে হিন্দুদের কি চক্ষে দেখেন, তা এসব জায়গায় মুসলমানদের না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।

পাঞ্জাবে এক শিখ ভিন্ন সকলেই মুসলমানের culture

আর রাজশক্তির কাছে হার স্বীকার করেছে। শিখ culture-ও মুসলমানী culture-এর খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমানের হাতে রাজশক্তি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু culture হিন্দী ভাষার জোরে নিজের স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের গোঁড়ামী কতকটা বেড়েছে বটে, কিন্তু হিন্দু consciousnessটা বেঁচে আছে।

ইংরেজের আমলে হিন্দুস্থানে আর পাঞ্জাবে মুসলমান cultureকে জয় করবার চেষ্টা করছে আর্য্যসমাজীরা। মুসলমানের হাতে এখন আর রাজশক্তি নেই; সুতরাং আগেকার রাজনৈতিক ঝগড়াটা এখন অন্য রূপ নিয়েছে। আর্য্যসমাজীদের ইচ্ছা যে, সমস্ত মুসলমানকে আর্য্যসমাজভুক্ত করে নেয়, উর্দ্দুর বদলে হিন্দী চালায়, আর সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পাঠান-মোগলদের বিজয় চিহ্ন মুছে ফেলে। আর্য্য-সমাজীদের হাতে রাজশক্তি থাকলে কি হতো বলা যায় না; কিন্তু তা যখন নেই, তখন তাঁদের চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমানকে 'শুদ্ধ' করে আর্য্য করা, আর উর্দ্দুকে তাড়িয়ে হিন্দী ভাষার প্রচলন করা। কিন্তু মজার কথা এই যে, মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর মেজাজটা হয়ে গেছে মুসলমানদের মতো। কোরাণের বদলে বেদ, মসজিদের বদলে আর্য্য-সমাজগৃহ; আর তবলিগের বদলে শুদ্ধির প্রতিষ্ঠা এঁরা করতে চান। এঁরা

মনে করেন যে, শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান সমাজকে ভেঙ্গে চূরে গ্রাস করতে পারবে না। তাই হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে চূরে এঁরা এমন একটা militant সমাজ গড়তে চান যা' মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

আর্য্যসমাজের চেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজ হয় তো একটু বদলাতে পারে, অন্ততঃ হিন্দু-সভার তরফ থেকে হিন্দু সংগঠনের চেষ্টা দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু মুসলমান সমাজকে গ্রাস করে ফেলবার শক্তি যে আর্য্য-সমাজের আছে, তা' মনে করবার কোন কারণ দেখতে পাই নে। কি সামাজিক হিসাবে, কি অধ্যাত্মদৃষ্টির হিসাবে আর্য্য-সমাজী মুসলমানের চেয়ে বড় নয়। সুতরাং এই ঝগড়ার ফলে মুসলমান আর হিন্দু সমাজ দুটোই আরও সঙ্ঘবদ্ধ আর militant হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কেউ কাউকে গ্রাস করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাংলার মুসলমানদের অবস্থা একটু আলাদা। বাংলায় মুসলমান অনেক; কিন্তু তারা প্রধানতঃ বৌদ্ধদের আর এ দেশের অধিবাসী হিন্দুদের বংশধর। বিদেশী মোগল-পাঠানের বংশধর এখানে নেই বললেই হয়। কাজেই এখানে বাংলা ভাষা ভেঙে উর্দ্দুর মতো একটা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয় নি। এখানকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঝগড়া, তা' প্রধানতঃ পাঞ্জাব আর হিন্দুস্থান থেকে আমদানী করা হয়েছে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালী হিন্দু আর বাঙ্গালী

মুসলমান দু'দলের মনেই গোঁড়ামীর ভাবটা একটু কম। দু'দলই যদি বাইরের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা' হলে cultural fusion হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আপাততঃ কিছুদিন ইংরাজী রাজ্যশাসন-নীতির প্রভাবে ভেদের মাত্রাটা একটু বেড়েই চলবে মনে হয়।

আপাততঃ যতদূর দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে, যদি মুসলমান ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতো ভারতবর্ষ থেকে চলেও যায়, তা' হলেও হিন্দু সমাজের উপর বেশ একটা ছাপ রেখে যাবে। শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ যদি মুসলমানদের প্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, তা' হলে হয়ত একদিন মুসলমান সমাজকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে। কিন্তু সে শক্তি অর্জ্জন করতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান রূপ অনেকটা বদলাতে হবে। নিজেকে সে রকম পরিবর্ত্তিত করবার শক্তি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আছে কি না জানি নে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, আর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এমন কোন মহাপুরুষের যদি আবির্ভাব হয়, যিনি হিন্দু সমাজকে আবার নূতন ছাঁচে ঢালতে পারবেন তা'হলে এই দুটো সমাজ মিশে গিয়ে একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন দু'দলের যে রকম অবস্থা তাতে কেউ কাউকে গ্রাস করবার চেষ্টা, বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়। আমার মনে হয়, অন্ততঃ বাংলা দেশের হিন্দুদের এখন নিজেদের সমাজটাকে শক্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা,

করাই ভাল। যাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই, তাদের পরকে গ্রাস করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হয়তো আত্মরক্ষা করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসার পথ দেখতে পাওয়া যাবে। তবে এ কথাটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, এদেশ যদি পরাধীন থাকে, তাহলে নূতন culture-ও গজাবে না, আর ছ'টো জাত মিশে গিয়ে একটা নূতন জাতও হবে না।

চৈত্র, ১৩৫২

॥ ৯ ॥

ভায়া,

কথায় বলে "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।" আমারও তেমনি মনে হয়। এই নির্ব্বাচনী-হল্লা শেষ হলেই মঙ্গল। কাদের দল কত ভারী তা' ঠিক করবার জন্যে গত কয়েক মাস ধরে চীৎকার, গালাগালি, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি, এমন কি খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। সকলেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ভোটের চোটে তাঁদের দলকে জয়যুক্ত করতে পারলেই ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হবে; দেশের বুড়ো হাড়ে একটা নবীন বসন্তের হাওয়া লাগবে; রোগ, শোক, জরা, অকাল-মৃত্যু সব দেশ ছেড়ে পালাবে। এক কথায় "মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।" এখন নির্ব্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাচ্ছি—'কেউ হাসিছেন, কেউ কাঁদিছেন, কেউ পাড়িছেন গাল।' যাঁরা হেরেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই বলছেন যে, অপর পক্ষের গুণ্ডামীর জন্যেই তাঁরা জিততে পারেন নি। ভদ্রভাবে নির্ব্বাচন হলে তাঁরা একবার দেখিয়ে দিতেন তামাসা। কিন্তু শত্রুপক্ষকে সে তামাসা দেখাবার সুবিধে আর তাঁদের হয় নি। কারও বা গাড়ী পুড়ে গিয়েছিল; অনেককে রক্তাক্ত দেহে

হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল; দু'একজনকে মা ভোটেশ্বরীর হাড়কাঠে বলি দেওয়াও হয়েছিল।

সত্যি সত্যি কারা গুণ্ডামী করেছিল তা' খবরের কাগজ পড়ে বোঝবার জো নেই। যাঁরা পাকিস্থানের বিরোধী তাঁদের কাগজগুলি পড়লে মনে হয় লীগপন্থীরা প্রায় সবাই এক একটি আস্ত গুণ্ডা। আবার লীগপন্থীদের কাগজ পড়লে মনে হয় যে, তাঁদের দলের মত এমন নিরীহ, শান্ত, শিষ্ট জীব আর ভূ-ভারতে নেই। কতকগুলি তথাকথিত মুসলমান শুধু লীগকে অযথা আক্রমণ করে খাঁটি মুসলিম জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল; আর তার ফলে যদি কোথাও দুই একটা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তো তার জন্যে এই বাজে মুসলমানের দলই দায়ী। কে যে বাজে মুসলমান, আর কে যে খাঁটি মুসলমান, তা' যখন জানা নেই, তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা শুধু নিষ্ফল নয়, বিপজ্জনক। কিন্তু হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, যাঁরা নির্ব্বাচন-যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে রক্তাক্ত দেহে ঐখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই লীগ-বিরোধী অর্থাৎ বাজে মুসলমান।

খাঁটি মুসলমানেরা যে নির্ব্বাচনে একটা কীর্ত্তি রেখে গেলেন তা বলাই বাহুল্য। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যখন ন্যাশনাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূম লেগে গিয়েছিল, তখন ন্যাশনাল কলেজের একজন অধ্যাপক পরীক্ষার সময়ে ছেলেদের প্রশ্ন করেছিলেন—"ভারতীয়

সভ্যতায় মুসলমানের অবদান কী?" একটি ছোট ছেলে অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর দিয়েছিল—"মুসলমানদের প্রধান দান— দাড়ী, পেঁয়াজ, মুর্গি ও খেলাফৎ।" ছেলেটা যে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড একজন research scholar হতে পারতো, তাতে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন বেচারাকে অধ্যাপকের কাছে বকুনিই খেতে হয়েছিল। আজ যদি তার সন্ধান পাই তো জিজ্ঞাসা করি—"আচ্ছা, বাবা বল দেখি, এই নির্ব্বাচনী কায়দায় খাঁটি মুসলমানী অবদান কী?"

আমাদের হিন্দু-মহাসভা লক্ষ্মণ সেন-সম্মত পন্থা অবলম্বন করে যুদ্ধ বাধবার আগেই রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন। ভালই করেছিলেন—

He who fights and runs away
Lives to fight another day—

নির্ব্বাচনের ফলে এ কথাটা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে অধিকাংশ হিন্দু ভোটার কংগ্রেস-পন্থী। কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এক কম্যুনিষ্ট দলের কয়েকজন ব্যতীত আর বড় কেউ আসরে নামেন নি; আর শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে লড়াই করেও তাঁরা ধরাশায়ী হয়েছেন। কম্যুনিষ্ট দলে যে অনেক ভাল লোক আছেন, তা' আমি জানি। তাঁরা যে দেশদ্রোহী এ কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি নে; কিন্তু তাঁদের গুরুকরণের ভিতর যে কোথাও বেশ একটু গলদ আছে, এ সন্দেহ আমার মন থেকে যায় নি। সাম্যবাদ আর ষ্ট্যালিনের পররাষ্ট্র-নীতি,

দুটো যে এক জিনিষ নয়, এ কথাটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান, আর নির্ব্বিচারে ষ্ট্যালিনের পররাষ্ট্র-নীতি সমর্থন করতে গিয়ে তাঁদের নেতারা এমন কতকগুলি কাজ করে ফেলেছেন, যা' এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফলে শুধু কংগ্রেসী মহলে নয়, দেশের জনসাধারণের কাছেও তাঁরা অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন; আর তারই ফলে তাঁদের নির্ব্বাচনে পরাজয় ঘটেছে। এই নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের সঙ্গে যখনই তাঁদের সংঘর্ষ হয়েছে, তখনি তাঁরা পাকিস্থানী-কায়দা অবলম্বন করতে ইতস্ততঃ করেন নি; এবং সত্যের খাতিরে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, কংগ্রেসী দলও যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তার সঙ্গে মহাত্মাজীর অহিংস আদর্শের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই।

এই ভ্রাতৃদ্রোহ দেখে আমার হাসির চেয়ে কান্নাই বেশী পায়। কেবল জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়?" যে দেশ স্বাধীন, যেখানে দেশের লোকের প্রতিনিধিরা সত্য সত্যই দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা, সেখানে নির্ব্বাচনের একটা মূল্য আছে। কিন্তু এখানে যে গোড়ায় গলদ। দেশের অধিকাংশ লোকেরই নির্ব্বাচনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। যে কয়জনের আছে, তাদের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক-সভায় গিয়ে কি করতে পারবেন বা না পারবেন, তা' স্থির করে দিয়েছেন আমাদের বিদেশী মনিবেরা। খোঁটায় বাঁধা গরু কতদূর পর্য্যন্ত মুখ

বাড়িয়ে ঘাস ছিঁড়ে খেতে পারবে, তা স্থির করে দিয়েছেন আমাদের বিদেশী জমিদারবাবুরা। তাঁরা বলে দিয়েছেন যে, এমনি করে খুঁটে-খুঁটে ঘাস খেতে খেতেই আমরা নাকি সারা মাঠে চরে বেড়াবার অধিকার পাবো। আর সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে আমরা আরম্ভ করেছি পরস্পরের মধ্যে গুঁতোগুঁতি। হায়রে কপাল!

নির্ব্বাচন আরম্ভ হবার আগে কংগ্রেসের অনেক নেতা বলেছিলেন যে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করার পর তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইংরেজকে দেশছাড়া করা। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করার সঙ্গে ইংরেজকে দেশছাড়া করাবার সম্বন্ধটা যে কি, তা' আমি এখনও ভাল বুঝতে পারি নি। মহাত্মাজী কিন্তু বলেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় হিসাবে নির্ব্বাচনী জয়লাভের উপর তাঁর তেমন আস্থা নেই। নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেসী সদস্যেরা যদি মন্ত্রীর পদ দখল করতে পারেন, তা' হলে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে সাহায্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। নির্ব্বাচনে যোগ দিয়ে ঐটুকুই লাভ। কিন্তু অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের মুখে মহাত্মাজীর এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই নি। যাই হোক, নির্ব্বাচনে তো কংগ্রেসের জয় জয়কার হয়েছে। এখন এই জয়লাভের ফলে ইংরেজরা সুশীল আর সুবোধ বালকের মতো দেশ ছেড়ে যায় কি না, তাই দেখবার জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি।

লীগের কর্ত্তারা তো বলেই দিয়েছিলেন যে, মন্ত্রিত্বের

কোন লোভই তাঁদের নেই ; আর সিন্ধুদেশে তাঁরা যে রকম করে তা' প্রমাণ করে দিয়েছেন, তার উপর আর কথা কওয়া চলে না। তবে লীগের প্রাণের কথা আমাদের সিদ্দিকী সাহেব যেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, এমন আর কেউ পারেন নি। He sometimes in his solitary moments thought of going down on bended knees and ask the Englishman to continue to be in India rather than allow these Brahminical blood-suckers to rule over him. "এক এক সময় তাঁর মনে হয় যে, ইংরেজের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বলেন—দোহাই, বাবা! রক্ত-শোষক বামুনদের হাতে আমাকে ফেলে দিয়ে তোমরা এদেশ ছেড়ে যেও না।"

ব্যস। পাকিস্থান কী জয়। এরি জন্যে এই নির্ব্বাচনী প্রহসন! এরি জন্যে এত মারামারি, খুনোখুনি ?

চৈত্র, ১৩৫২

॥ ১০ ॥

ভায়া,

তুমি জানতে চেয়েছ—পাকিস্থান সম্বন্ধে আমার সত্যিকার মত কি ? অর্থাৎ হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন কি না ? আর যদি এক নেশন না হয়, তা' হ'লে এক রাষ্ট্রের ভিতর তাদের ভদ্রভাবে বাস করা চলতে পারে কি না ? এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—যুক্তি-তর্ক দিয়ে এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা কস্মিনকালেও হবে না। মুসলমানেরা যদি মনে করেন যে, তাঁরা আলাদা নেশন, তা' হলে কোন যুক্তি-তর্কই তাঁদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে বাস করতে গেলে যদি তাঁদের মনে হয় যে, একদম বিদেশে এসে হাঁপিয়ে উঠছি; আমাদের শঙ্খ-ঘণ্টা শুনলে যদি তাঁদের কানে আঙ্গুল দিতে হয়; আমাদের ঠাকুর-দেবতা দেখলে যদি সেগুলো ভেঙ্গে দেবার জন্যে তাঁদের হাত নিশপিশ করে ওঠে; তা' হলে হয় আমাদের কাছা খুলে নমাজ পড়ে তাঁদের দলে ভিড়ে যেতে হয়, নয় তো তাঁদের গোবর খাইয়ে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে জাতে তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এই দুটোর মধ্যে কোনটাই যখন আপাততঃ হবার কোন সম্ভাবনা নেই ; আর যুক্তি-তর্কও যখন নিষ্ফল, তখন তৃতীয় পন্থা খুঁজে বার করা ছাড়া আর উপায় কি ?

নেশন কথাটাকে এই যুক্তি-তর্কের ভিতর টেনে না আনাই ভাল। কথাটা একে বিদেশী; তার উপর তিন চারশো বছর আগে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইউরোপের জাতগুলো আগে রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিত না—তখন সারা ইউরোপই ছিল খ্রীষ্টীয় সমাজ, সেইটাই ছিল তাদের পরিচয়। তার পর নানা কারণে পোপের প্রভাব কমে গেল। ভিন্ন ভাষাভাষী জাতগুলো আস্তে আস্তে দানা বেঁধে নিজেদের জন্যে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গড়ে তুললে; আর তারাই হয়ে দাঁড়ালো আলাদা আলাদা নেশন। এই ভিন্ন ভিন্ন নেশনগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নখদন্ত শানিয়ে রেখেছে; আর গত তিনশ' বছর ধরে তারাই সারা পৃথিবীময় দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

আমাদের দেশে একটা বিরাট হিন্দু সমাজ আছে; কিন্তু নেশন বলতে যা বুঝায়, সমাজ জিনিষটা তা নয়। বাইরে থেকে মোগল পাঠান এ দেশে এসে হিন্দু সমাজের খানিকটা ভেঙ্গে দিয়ে এখানে একটা মুসলমান সমাজ গড়ে তুলেছে; কিন্তু ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে যেমন একটা খ্রীষ্টান নেশন গড়ে ওঠে নি, মুসলমানদের ভিতরও তেমনি ধর্ম্মের প্রভাবে একটি মুসলমান নেশন গড়ে ওঠে নি। বোগদাদের খলিফাদের আমলে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব খুব ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু আজ খলিফার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ নানা নেশনে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তুর্ক,

আরবী, পারসী, আফগান সবাইকার ধর্ম্মই এক; কিন্তু তা' বলে তারা নিজেদের এক নেশনভুক্ত বলে মনে করে না। মিশরী আর আরবের ভাষা এক; কিন্তু আমেরিকা আর ইংরেজ যেমন এক ভাষাভাষী হয়েও ভিন্ন নেশন ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়, মিশরী আর আরবীও তেমনি এক ভাষাভাষী হলেও নিজেদের এক নেশন বলে মনে করে না।

খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে যে কথা খাটে, ক্রমশঃ এদেশেও বোধ হয় সেই কথাই খাটবে। হিন্দুস্থানী, মারাঠী, উড়িয়া, গুজরাটী, অন্ধ্র, মাদ্রাজী সবাই হিন্দুসমাজভুক্ত। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে এরা সবাই নিজেদের এক-নেশনভুক্ত বলে মনে করবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। নিজেদের কথাই ভেবে দেখ না। বাঙ্গালী হিন্দুরা ধর্ম্ম বা সমাজের দিক থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে অভেদ অঙ্গ; কিন্তু আমরা যে একটা আলাদা জাতি, এ বোধ আমাদের বিলক্ষণ আছে। হিন্দু ব'লে তো আমরা হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, গুজরাতী বা মারাঠীদের ভিতর নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা লোপ করে দিতে চাই নে। আলাদা নেশন হবার বীজ আমাদের মধ্যে রয়েছে যে। আমরা ইউরোপীয় নেশনগুলোর মতো হয় তো সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবো না। সকলে মিলে ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ একটা বিরাট ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়ে তুলবো। ভারতবর্ষে হয় তো একটা League of Indian

Nations গড়ে উঠবে; কিন্তু তাকে যে ঠিক Indian Nation বলা চলবে তা' আমার মনে হয় না।

এই ঘরের বিড়ালই বনে গিয়ে বন্-বিড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হিন্দু সমাজ ভেঙ্গেই ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছে। কাজেই হিন্দু সমাজের ভিতর যেমন ভিন্ন ভিন্ন নেশন গড়বার মাল-মসলা রয়েছে, মুসলমান সমাজের ভিতরও ঠিক তাই রয়েছে। কাজেই মনে হয় এ দেশের মুসলমান নেতারা, এ দেশের মুসলমানদের যতই এক নেশনভুক্ত করবার চেষ্টা করুন না কেন, আরবী, পারসী, আফগান যেমন ভিন্ন ভিন্ন নেশনে পরিণত হয়েছেন, এ দেশের মুসলমানেরাও তাই হবেন। বাঙ্গালী-হিন্দু আর পাঞ্জাবী-হিন্দু যদি ক্রমে আলাদা নেশনে পরিণত হয়, তা' হলে বাঙ্গালী-মুসলমান আর পাঞ্জাবী-মুসলমানও তাই হবে। জিন্না সাহেব এখন পাকিস্থান গড়বার খাতিরে যতই চীৎকার করুন না কেন, পাঠান-মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান আর বাঙ্গালী-মুসলমান কেউই এক নেশনত্বের খাতিরে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা হারাবেন না। পাকিস্থান যদি হয় তা' হলে এঁদের আভ্যন্তরীণ ভেদ ক্রমশঃ ফুটে উঠবে। তখন বাঙ্গালী-মুসলমান যদি আবিষ্কার করেন যে, পাঠান-মুসলমানের চেয়ে তাঁর বাঙ্গালী-হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য অনেক বেশী, তা' হলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পাকিস্থানের নবীন উত্তেজনা ততদিনে সম্ভবতঃ একটু শিথিল হয়ে আসবে।

তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করবে—হিন্দুসমাজের ভিতর তো ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ও ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী রয়েছে। তা' হলে হিন্দুসমাজের খানিকটা অংশ যদি মুসলমানী সাধন-প্রণালী গ্রহণ করে, তা' হলে তাদের ভিতর স্বতন্ত্র নেশন গড়বার ইচ্ছা আসে কোথা থেকে? ঠিক এই কথাই আমি একবার আমার একজন মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আমি বলেছিলুম—"আচ্ছা, ভাই, আজ যদি আমি তোমার কাছে কলমা পড়ে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিই, তা' হলে সেই কলমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেশী নাম ছেড়ে দিয়ে একটা আরবী-ফার্সি নাম নিতে হবে কেন? আমার নেঙ্গা শিরের উপর একটি তুর্কী-ফেজ চড়াতে হবে কেন? আর আমার সনাতন ধুতি-চাদর ছেড়ে আমাকে একটা পা'জামা বা আঠারোটা বোতামওয়ালা আলখেল্লাই পরতে হবে কেন?" বন্ধুটি শুধু হেসেছিলেন; কোন স্পষ্ট জবাব দেন নি। এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমান হওয়া মানে শুধু একটা নূতন সাধন-প্রণালী গ্রহণ করা নয়। যে দেশে ঐ সাধন প্রণালীর জন্ম সে দেশের আচার-ব্যবহার, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত যথাসম্ভব গ্রহণ করে নিজের পুরাতন সমাজকে অস্বীকার করা। আমাদের নেটিভ খ্রীষ্টানেরা যেমন ফিরিঙ্গি সেজে পেণ্টালুন পরে, আর ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজীতে 'হোমে'র গল্প করে—এ-ও কতকটা তাই। বিজিত দেশে নিজেদের দল বাড়াবার জন্যে মোগল

পাঠান বা আরবী বিজেতাদের এইটাই ছিল রাষ্ট্রীয় পলিসি। আজ যে বাঙ্গালী-মুসলমানেরা, এমন কি ত্ব'তিন পুরুষ আগে পর্য্যন্ত যাঁরা হিন্দু ছিলেন তাঁরাও যে পাকিস্থানী বুলি আওড়াতে আরম্ভ করেছেন, এইখানেই তার মূল। কিন্তু মূল যাই হোক, রোজ রোজ লড়াই-ঝগড়া করে তো আর কারও সঙ্গে পাশাপাশি বাস করা চলে না। কাজেই বাঙ্গালা দেশের মুসলমানেরা যদি স্বতন্ত্র পাকিস্থান গড়তে চান, তো আমি বলি—তথাস্তু। লোকসংখ্যা হিসাবে যখন তাঁরা বাঙ্গালা দেশের পৌনে ন' আনা অংশ পাবেন, তখন তাঁরা তা' জরিপ করে মেপে নিয়ে সদলবলে সেইখানে গিয়ে নূতন রাজ্য ফাঁত্বন; আর তাঁদের ভাগে যে সব হিন্দু এখন বাস করেন, তাঁদের আমরা পুরানো বাঙ্গলায় টেনে নিয়ে আসি। জোড়া বাঙ্গালা আবার ভেঙ্গে যেতে দেখে লর্ড কর্জনের আর ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রেতাত্মারা তুষ্ট হয়ে অট্টহাস্য হাসতে থাকুন আর স্থরাবর্দী, ইস্পাহানি, সিদ্দিকি কোম্পানীর আঙ্গুল ফুলে শাল গাছ হোক। অতএব বলো ভাই একবার প্রাণভরে—পাকিস্থান কী জয়।

বৈশাখ, ১৩৫৩

ভায়া,

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখলাম, আকাশে যেন কালো মেঘের বান ডেকেছে। গগনচারী দেবতারা তাড়াতাড়ি আপনার আপনার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বসে আছেন; একটা জোনাকির পর্য্যন্ত নামগন্ধ নেই। চারিদিক্ একেবারে নিঝুম, নিস্পন্দ। বুঝলাম আজ দেবলোকে কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আকাশের এই অন্ধকার রূপের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি, এমন সময় বেশ বড় এক ফোঁটা জল কোথা থেকে লাফিয়ে এসে আমার নাকে তিলক কেটে দিল। সেদিন সন্ধ্যার আগেই আফিমের মাত্রাটা বেশ একটু চড়িয়েছিলাম। এ রকম বদ্‌রসিকতায় মৌতাত চটে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি; এমন সময় প্রথমে টপাটপ্ পরে ঝমাঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

একে হাতে কাজকর্ম্ম নেই; তার উপর ব্রাহ্মণীও গেছেন বাপের বাড়ী। সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চার এই উপযুক্ত অবসর ভেবে প্রদীপটাকে একটু উস্‌কে দিয়ে মহাভারতখানা কোলের কাছে টেনে নিলাম।

বইখানা খুলেই দেখি, বনপর্ব্বের মাঝখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহা বিপদে পড়েছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষরূপ ধরে

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। যুধিষ্ঠিরের তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। শাস্ত্রচর্চ্চা-উপযোগী মেজাজ একেবারেই নয়। কিন্তু করেন কি? সরোবরের তীরে যা' দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যে বৃকোদরের হুঙ্কারে পাহাড় কেঁপে উঠতো, তাঁর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই। তিনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফের উপর কাদা লাগিয়ে সরোবরের তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব একেবারে ছিট্‌কে পড়েছে, তূণভ্রষ্ট পাশুপত অস্ত্রের উপর একটা কোলাব্যাঙ বেশ আরামে বসে চক্ষু বুজে সঙ্গীত-আলাপ করছে। নকুল, সহদেবের তখন ফুটন্ত ফুলের মতো মুখ দু'খানি একেবারে কাল্‌চে মেরে গেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাণটা ভ্রাতৃস্নেহে কেঁদে উঠলো। ধর্ম্মরাজের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল বলেই কি অমন শূরবীরের মতো ভাইগুলোকে প্রাণে মারতে হয়!

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সহানুভূতিতে ফুলে আমার বুকখানা যেমনি ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটাও গেল নিভে। শূন্য বিছানায় শুতে যাবারও বিশেষ প্রলোভন ছিল না। আর মনটাও ধর্ম্মরাজের অবিচারে একটু খারাপ হয়ে গেছলো। তাই চুপ-চাপ করে সেইখানেই পড়ে রইলুম।

* * *

হঠাৎ মনে হলো আমার পিঠে যেন ছপাং করে একগাছা

চাবুক পড়লো, আর মনে হলো, কে যেন আমার টিকির গোছা ধরে টান্‌তে টান্‌তে আমার শরীর থেকে আত্মা-পুরুষকে বার করবার চেষ্টা করছে। আমি চীৎকার করতে গেলুম। কিন্তু মুখে কোন শব্দই হলো না। আমার তো ভয়ে অঙ্গ হিম হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছি—এ আবার কার পাল্লায় পড়লাম। এমন সময় শব্দ হলো—"ভয় নেই, ভয় নেই; তুমি আমার কথাই ভাবছিলে, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তুমি যুধিষ্ঠিরের ভাইগুলোর জন্য দুঃখে কাহিল হচ্ছিলে; কিন্তু আমি এই চারটি প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি; আর যারা সদুত্তর দিতে পারে নি, তাদের সকলেরই ঐ দশা হয়েছে।"

তখন আমার হুঁস হলো। বুঝলাম, তা' হলে ইনিই হলেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম। একটু সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু ধর্ম্মরাজ! আপনি যে পাণ্ডবদের ছাড়া আর কাউকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, সে কথা তো শাস্ত্রে লেখে না।" ধর্ম্মরাজ একটু হেসে বল্‌লেন—"লেখে বৈ কি! তবে সে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা নয় বলে তোমরা মানো না। আমি সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাও যে জানি, এটা স্বীকার করলে যে তোমাদের শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে! আর তা ছাড়া আরও একটি কথা কি জান, আমি বহুরূপী বলে লোকে, আমাকে সব সময় চিনতে পারে না।"

—"ওঃ! তাই নাকি? আমি তো জানতাম আপনি বৃষরূপেই বুড়ো শিবকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ান; আর কখনো বা বকরূপ ধরে পুকুরের পাড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করেন।"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে একটা হেঁচকা টান মেরে বল্লেন—"এত বুদ্ধি না হলে আর তোমরা গোল্লায় যাবে কেন? এই যে সেদিন কুলি-মজুরের রূপ ধরে রুশিয়ার জারকে (Czar) ঐ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা' বুঝি তোমরা বুঝতে পারো নি?

আমি তো ভয়ে হাঁ করে ফেললাম। ধর্ম্মরাজ যে বুড়ো বয়সে বলশেভিক সেজে দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে বেড়াবেন, এ কথা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, কি করে বিশ্বাস করি বলো! কিন্তু কিছু বল্‌তে আমার সাহস হলো না। তখন আমার টিকিতে হাত যে! ধর্ম্মরাজ কিন্তু অন্তর্য্যামী কি না! টপ্ করে আমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পেরে বল্‌লেন—"আমি বলশেভিক, টলশেভিক-কিছুই নই। ওটা আমার ইউরোপে এ যুগের রূপ মাত্র। একদিন আসবে যখন ষ্ট্যালিনকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। চার্চ্চিলও বাদ যাবে না।"

ধর্ম্মরাজের প্রোগ্রামটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। বলশেভিকদের কথা ভেবে আমার পেটের পিলে তখনও চম্‌কে-চম্‌কে উঠছিলো। আমি সবিনয়ে নিবেদন করলুম—

"মহারাজ কিন্তু আপনার পূজোয় এতটা রক্তারক্তি কি ভাল হলো ?"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে আর একটা হেঁচ্‌কা মেরে বল্‌লেন—"বাবা, আমি তো তোমাদের কংগ্রেস ক্রীডে এখনও সই করি নি। আর তোমাদের দেশের চাল-কলার নৈবেদ্যের উপর নির্ভর করে যদি আমাকে বাঁচতে হতো, তা' হলে ভগবান্ আমাকে অমর কোরে সৃষ্টি করলেও আমাকে এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতে হতো। তোমরা আমার বক-রূপটিকেই চিনেছ বলে সবাই বকধার্ম্মিক সেজে আলোচালের উপর দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে কাজ সারতে চাও। কিন্তু আমি আমার পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করে নিতে ভুলি নে। তোমরা মরতে ভয় পাও বলে আমি তো আর মারতে ভয় পাই নে। তোমরা অহিংসার দোহাই দাও বলেই আমাকে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা আর দুর্ভিক্ষের রূপ ধরে নিজের হিসাব বুঝে নিতে হয়।"

কথাগুলো একটু বাঁকা রাস্তায় চল্‌ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো পাল্‌টে নেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম—"প্রভুপাদ ! ইউরোপে তো আপনার যাতায়াত আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার পর আপনি কি এদেশে আর আসেন নি ?"

ধর্ম্মরাজ বললেন—"দেখ, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পর প্রায় হাজার বৎসর এদেশে আসি নি। তারপর যখন

এলুম, তখন দেখলুম, সে ক্ষত্রিয়কুল একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। মহানন্দ নামে একটা বুড়ো মড়া-খেকো রাজা মগধের সিংহাসনে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোচ্ছে, আর রাজ-প্রসাদসেবী ব্রাহ্মণেরা খুব টিকি দুলিয়ে দুলিয়ে যজ্ঞের ভস্মে ঘি ঢালছেন। সব ক'টার টিকি টেনে টেনে দেখলুম—আরে রামচন্দ্র! একেবারে পরচুলের সাজান টিকি। টান দিতেই খসে এলো। কেবল এক গোছা টিকি টানতে গিয়ে দেখলুম—হাঁ, টিকির মত টিকি বটে; একেবারে মগজ থেকে বেরিয়েছে। টিকিধারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—পণ্ডিতজীর নাম? ব্রাহ্মণ আমার আপাদমস্তক, তীব্র দৃষ্টিতে দেখে বল্‌লেন—কৌটিল্য। সে রকম তীক্ষ্নদৃষ্টি ভারতবর্ষে আর বেশী দেখেছি বলে মনে হয় না। হাঁ, একটি মানুষের মতো মানুষ বটে! নমস্কার করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি পণ্ডিতজী, বার্ত্তা কি? কৌটিল্য বল্‌লেন—বার্ত্তা এই যে, যারা ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়, তারাই এখন ভারতের রাজা।

আমি বললাম—বটে! কি আশ্চর্য্য!

কৌটিল্য খুব চালাক লোক। কথাটি শুনে বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বল্‌লেন—আশ্চর্য্য বৈ কি! যাদের চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠছে, সিংহাসন যাদের টল্‌ছে, তারাও চিরদিন লোকের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবার স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে, তাদের রাজ্য চিরস্থায়ী।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাই তো পণ্ডিতজী; চারি দিকে যখন গণ্ডগোল, তখন এ রাজ্যে সুখী কে?

কৌটিল্য একটু হেসে উত্তর দিলেন—ধ্বংসের মধ্যে যারা নূতন সৃষ্টির বীজ দেখতে পাচ্ছে তারাই সুখী।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—এই নূতন সৃষ্টির পন্থা কি, পণ্ডিতজী।

কৌটিল্য একটু চিন্তিত হলেন। শেষে বল্লেন—দেখুন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি; পুরাতন ভিত্ উপ্ড়ে ফেলে আবার নূতন করে গোড়াপত্তন করা ছাড়া আর উপায় নেই। দেশে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আর নেই। অর্থহীন সংস্কারের চাপে প্রকৃত ধর্ম্ম নষ্ট হতে বসেছে। দ্রোণাচার্য্য যাদের নিষাদ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, গুরুদক্ষিণা গ্রহণের ভান করে তিনি যাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে রাখবার সংকল্প করেছিলেন, আমি সেই শূদ্রকেই সংস্কারপূত করে রাজা করে তুলবো, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে বসাব। দেশকে তোলবার ঐ এক পন্থা।

কৌটিল্যকে আশীর্ব্বাদ্ করে ফিরে এলুম। দেখলুম, তখনও ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব হয় নি।”

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—“তারপর এদেশে কখনও আপনার পদধূলি পড়ে নি?”

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—“এসেছিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার দেখে এদেশে ঢোকবার আর প্রবৃত্তি হয় নি। দেখলুম—ভারতের

দরজার কাছে মহম্মদ ঘোরী তার দেড় হাত লম্বা দাড়ি নিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে; আর রাজপুতেরা খুব বড় বড় পাগড়ি বেঁধে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরে, ধুম ধাড়াক্কা করে নিজেদের মধ্যে ফুর্ত্তিসে লাঠালাঠি করতে লেগে গেছে। ভগবান যাকে মারেন, তাকে যে আগে থেকেই অন্ধ করে দেন, তা' স্পষ্টই দেখতে পেলুম। বুঝলুম, কৌটিল্যের নূতন সৃষ্টির কল্পনা কৌটিল্যের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেছে।"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"মোগল বাদশা'দের আমলে কখনও এখানে এসেছিলেন কি?"

ধর্ম্মরাজ বললেন—"এসেছিলুম একবার। আলমগীর বাদশা তখন বুড়ো বাপের মৃত্যু কামনা করতে করতে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীর দিকে সবেগে ছুটে চলেছেন। হজরতজী যে রকম প্রচণ্ড ধার্ম্মিক, তাতে মোগল বাদশাদের তক্তে যে ঘুণ ধরেছে তা' আর বুঝতে বাকী রইল না। তাঁকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন বোধ করলুম না। তখন মোগল-দরবারে একজন মারাঠী যুবকের কথা অল্প-বিস্তর শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে হলো, একবার ছোকরাকে দেখে আসি। সহ্যাদ্রির পাদদেশে এসে দেখলুম, একজন দীর্ঘকায় বীরলক্ষণ-চিহ্নিত উন্নত ললাট গৌরবর্ণ, পুরুষ কল্পনার বলে ভবিষ্যৎ ভারতের সৃষ্টি করছেন, আর মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। বুঝলাম এই শিবাজী। অনেক দিন পরে একটা

খাঁটি মানুষ দেখে আমারও আনন্দ হলো। আমি আশীর্ব্বাদ করে তাঁকে আমার চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম। শিবাজী বল্‌লেন—মহারাজ! মুষ্টিমেয় তুর্ক্‌ এসে ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তিকে পদানত করে রেখেছে, এই একমাত্র বার্ত্তা। যাদের জোরে তুর্ক সিংহাসনে বসে আছে, তারা একবার স্বপ্নেও ভাবে না যে সংঘবদ্ধ হলে তারাই দেশের অধীশ্বর হতে পারে —এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি? এ মোহ যে ভেঙ্গে দিতে পারে সেই সুখী। আমি মহারাষ্ট্রের শক্তি উদ্বুদ্ধ করে তাকে সমগ্র ভারতের কর্ত্তা করে দেবো—এই আমার পন্থা।

ধর্ম্মরাজ বল্‌লেন—আমি যা' ভয় করেছিলাম, তাই হলো। পন্থার কথাটা শুনেই আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল যে, হয় তো মারাঠার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু থাকবে না! হলোও তাই। বর্গীর তরবারি একবার বিদ্যুতের মত সকলকার চোখ ঝলসে দিয়েই আবার অন্ধকারে ডুবে গেল।"

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মনে হলো যেন ধর্ম্মরাজের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলুম— "তারপরে আর এদেশে আসেন নি, বোধ হয়।"

ধর্ম্মরাজ বল্‌লেন—"না। এখনও আসবার ইচ্ছা ছিল না তবে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র দেখে হিসাব করে বললে যে, ভারতের প্রায়শ্চিত্তের দিন না কি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই একবার

তোমাদের দেখে-শুনে যেতে এলাম! আচ্ছা, তুমিই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি—বার্ত্তা কি?"

ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি বল্‌লাম—"দোহাই ধর্ম্মরাজ; আমি রাজারাজড়া নই; আর ওয়াভেলী কায়দার প্রসাদাৎ আমার লাট-পরিষদের সদস্য হবার সম্ভাবনাও নেই। আমি নিতান্তই গরীব ব্রাহ্মণ। শেষে আপনার পরীক্ষায় ফেল হয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে কি ব্রাহ্মণীকে অনাথা করবো?"

ধর্ম্মরাজ হেসে বল্‌লেন—"আরে, ভয় নেই, ভয় নেই! তোমরা কি আর বেঁচে আছ যে তোমাদের আবার মারবো?"

তখন আমি সাহস পেয়ে বল্‌লাম—"হ্যাঁ, তা বটে! আর আপনি যখন নাছোড়বান্দা তখন আমার বিদ্যের দৌড়টাই দেখে যান। এদেশের এখন প্রধান বার্ত্তা হচ্ছে এই, দেশের সব মাতব্বর পুরুষেরা স্থির করেছেন যে, কোন রকমে একবার নূতন লাট পরিষদের সদস্য হয়ে জাপানী যুদ্ধের খরচটা জুগিয়ে দিতে পারলেই চালের দর আর কাপড়ের দর একদম নেমে যাবে, ছেলেদের পেটের পিলে সেরে যাবে, সাদায়-কালায় গলা ধরাধরি করে নৃত্য করতে থাকবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত সব দূর হয়ে যাবে; এক কথায় ভারতে সভ্য যুগের প্রথম লক্ষণ দেখা যাবে।"

ধর্ম্মরাজ খুসী হয়ে বল্‌লেন—"বেশ, বেশ। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও—সুখী কে?"

আমি বল্‌লাম—“ধর্ম্মরাজ, এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। এদেশে সুখী দুই দল—মাড়োয়ারী ব্রাদার্স আর ভুলাভাই কোম্পানী।”

তখন তৃতীয় প্রশ্ন হলো—“আশ্চর্য্য কি ?”

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম—“হুজুর, আমরা যে এই বুদ্ধি নিয়ে এখনও বেঁচে আছি, এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।”

ধর্ম্মরাজ পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নেড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—“আচ্ছা, এখন পন্থা কি ?”

আমি ধর্ম্মরাজের পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম—“হুজুর, ঐটি আমার মাফ করতে হবে। পন্থা বাত্‌লে দিতে গিয়ে কি বল্‌তে কি বলে ফেলবো। আমি আর এ বয়সে ঠ্যাঙ্গানি খেতে পারবো না। আমায় রামে মারলেও মেরেছে ; রাবণে মারলেও মেরেছে। উত্তর না দিলে আপনার হাতে মারা পড়বো আর উত্তর দিলে আবার কালই আমায়—”

হোঃ হোঃ হোঃ শব্দে একটি বিরাট হাস্য করে ধর্ম্মরাজ আমার টিকিটা ছেড়ে দিলেন। দিতেই ঠক্ করে টেবিলের উপর আমার মাথাটা ঠুকে গেল।

* * *

হোঃ হোঃ হোঃ !

চেয়ে দেখি, আমার বড় নাতি সুমুখে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসচে।

"ও দাছু, এরই মধ্যে বসে বসে ঘুমুচ্ছ ? ভাত খাবে না ?"

"ভাত কি রে ? ধর্ম্মরাজ চলে গেছেন ?"

"সে আবার কে ? স্বপন দেখছ না কি ?"

"স্বপন কি রে ? এই যে এতক্ষণ আমার টিকি ধরে বসেছিল !"—বলে উঠ্‌তে গিয়ে দেখি যে ব্রাহ্মণী যে দড়িগাছটায় গামছা ঝুলিয়ে রাখতেন, সে দড়িগাছটা ছিঁড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, আর তার একটা মুখ আমার টিকির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।"

কি ছুঃস্বপ্ন !. গোবিন্দ, গোবিন্দ ! নাতিকে বল্‌লুম—"চল্ ভাই, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়িগে। আর রাজা-উজীর মেরে কাজ নেই।"

আষাঢ়, ১৩৫২

॥ ১২ ॥

ভায়া,

যে দেশে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে গেরুয়া কাপড় আর নাক টেপাটিপি, সে দেশে ধর্ম্মের কথা বলতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তুমি বলবে এক, লোকে বুঝবে আর! তুমি গড়তে যাবে শিব, আর গড়ে উঠবে বানর! শুন্‌বে একটা মজার গল্প?—সে আজ অনেক দিনের কথা। রাজপুতানায় সে-বার ভারি দুর্ভিক্ষ। তাই বাংলাদেশ থেকে দু'জন সন্ন্যাসী গিয়ে কিষণগড়ে সাহায্য-কেন্দ্র খুলেছিলো। অনেক-গুলো অনাথ ছেলে-পিলে আর নিরাশ্রয় বুড়ো তাদের স্কন্ধে এসে পড়েছিল।

অর্থসাহায্য তখনও বেশী পাওয়া যায় নি; সুতরাং ভিক্ষা-শিক্ষা করে সন্ন্যাসীরা যা-কিছু পান, তাই স্বহস্তে পাক করে বেচারাদের খেতে দেন। এমন সময় সেখানকার একজন নামজাদা পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের কাছে এসে উপস্থিত। খুব শাস্ত্রীয় রকমে প্রণাম করে তিনি নিবেদন করলেন— "মহারাজ! আপনারা যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তখন আপনাদের আবার এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি কেন? এসব তো সংসারীর কাজ!"

যে-রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পণ্ডিতজী প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা

করলেন, তা'তে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি বয়সে ছোট, তিনি খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা সত্ত্বেও ফিক্ করে হেসে ফেলে উত্তর দিলেন—"কি করি, পণ্ডিতজী, আমাদের তো ইচ্ছা যে বনে গিয়ে জপ-তপ করি, কিন্তু সংসারীর কাজ সংসারীরা করে না ; তাই আমাদের আসতে হয়েছে।"

পণ্ডিতজীর মতে কিন্তু শাস্ত্রীয়-ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে কথাটা খাপ খেলো না। তিনি সন্ন্যাসীদের পরকালের জন্য বিষম চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু মহারাজ, শাস্ত্রে যে বলে, কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার পর ফের কর্ম্ম করলে নিরয়গামী হতে হয়!" সন্ন্যাসী হয়ে তো শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করা চলে না। অথচ সন্ন্যাসী হলে কি হয়, কল্‌কাতার ছেলে তো বটে! আমাদের ছোট সন্ন্যাসী মহারাজ তাই উত্তর দিলেন—"তা হবে বৈ কি, পণ্ডিতজী! শাস্ত্র তো মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের যখন সাহায্য করতে এসেছি, তখন নরকে যাওয়া ভিন্ন আর গতি কি? দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের দু'টো খেতে দিতে এসেছি বলে ভগবান যদি নরকই ব্যবস্থা করেন, তো যাওয়াই যাবে।"

পণ্ডিতজী কিন্তু তুষ্ট হলেন না। কলিকালে শাস্ত্রের অপমান দেখে ক্ষুণ্ণ মনে বিড়-বিড় করতে করতে চলে গেলেন।

আর একবার ঘুরতে ঘুরতে আমার এক ভবঘুরে বন্ধুর সঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে

উপস্থিত। বাংলায় তখন স্বদেশীর নূতন ধূম লেগে গেছে। সন্ন্যাসীর কাছে অনেক গৃহস্থ লোকের সমাগম হয় দেখে আমার বন্ধুটি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সবিনয়ে বল্লেন—"মহারাজ! দেশী কাপড়-চোপড় ব্যবহার করার দিকে এসমস্ত লোককে যদি একটু দৃষ্টি রাখতে বলেন, তো সমাজের অনেক মঙ্গল হয়।"

সন্ন্যাসী মহারাজ পরম বিজ্ঞ ভাবে মুখখানি গম্ভীর করে বল্লেন—"ও সমস্ত অনিত্য বস্তুর দিকে এদের প্রেরণা দিয়ে কি লাভ?" বন্ধুটি অদূরে পূরি, জিলাপি, রাবড়ি প্রভৃতি ভূরিভোজনের ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন—"মহারাজ! দেশের সব ব্যবসা-বাণিজ্যই যদি বিদেশীর ঠেলায় মাটি হয়, তা' হলে কিছুদিন পরে লোকে আর আপনাদের ও রমক তোফা সেবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে না।" বলা বাহুল্য, যুক্তিটা ঠিক শাস্ত্রীয় না হলেও সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণে লেগেছিল।

আসল কথা কি জান, সেই যে কবে শঙ্করাচার্য্য বলে গিয়েছেন যে, জ্ঞান আর কর্ম্মের সমন্বয় হবার জো নেই তারই জের আজ পর্য্যন্ত চলছে। যুক্তির কসরতে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, জগৎটা একদম বন্ধ্যা-পুত্রের মতো সাফ মিথ্যা! যেহেতু ব্রহ্মই সত্য, আর একমাত্র সত্য, সেহেতু জগৎটা মিথ্যা হতে বাধ্য! জ্ঞানী-সমাজে এই রকম ভাবে অপমানিত হবার পর জগৎটার উচিত ছিল,

শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করে একেবারে দেখতে দেখতে চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া; অন্ততঃ লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকা। কিন্তু বেহায়া জগৎটার মধ্যে সে-রকম শুভবুদ্ধি কিছু দেখা গেল না। সে চিরদিন অনন্ত মহাকাশ জুড়ে আপনার উন্মত্ত আনন্দে যে রকম নেচে আসছিল, তেমনি নাচতে লাগল। জ্ঞানীদের রাশি রাশি বচনের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। জ্ঞানীরা তখন চটে গিয়ে ব্যবস্থা দিলেন—"এ সংসার যখন আমাদের কথা শোনে না, তখন আর এর মুখ দর্শন করা হবে না; চলো সবাই মিলে বনে যাই।"

কিন্তু হায়রে! বনে গিয়েও কি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বৈরাগ্য-চর্চ্চা করে জুড়োবার জো আছে? প্রথমতঃ, দিনের বেলা দু'টি রাঁধা-ভাত পাওয়া মুস্কিল, দ্বিতীয়তঃ, রাত্রে মশা কামড়ায়। জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা মহাজ্ঞানী, তাঁরা তাই বন থেকে পালিয়ে পাহাড়-পর্ব্বতে গুহার মধ্যে ঢুকে নাকে-কানে তুলো গুঁজে একেবারে সমাধিস্থ হবার যোগাড় করলেন। এখনও যদি নর্ম্মদার তীরে ঘুরতে যাও, তো তাঁদের দু'-দশ জন বংশধরের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ না হয়, তা' নয়।

তাঁরা তো সমাধিস্থ হলেন, ভাবলেন প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে ব্রহ্মপুরুষকে নিয়ে দিন কাটাবেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ছেড়ে তাঁদের যদি বা চলে, ব্রহ্মপুরুষের যে চলে না। জগৎ সৃষ্টি যে তাঁর নিত্যকর্ম্ম। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ।"

আমাদের দেশের বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের যে বিরোধ বাধিয়ে বসে আছেন, তার মূল কথাটা এই যে, ব্রহ্মই নিত্য, আর সংসার অনিত্য। সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের কর্ম্ম খসে পড়বেই। কিন্তু যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন না কেন, তাঁকে সকাল সন্ধ্যা দু'টি ডাল-ভাত, না হয় 'শুখা-চাপাটি' খেতেই হবে। তিনি কর্ম্ম ছাড়লে হবে কি, কর্ম্ম তো তাঁকে ছাড়ে না। আর কাজ যখন বাস্তবিকই খসে পড়ে না, তখন স্বীকার করতেই হবে যে, যেখান থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি, সেই ভগবানের মধ্যেই কর্ম্মের বীজ নিহিত। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" যা-থেকে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, তাঁকে না ছাড়লে কর্ম্মও ছাড়া যায় না। জ্ঞানলাভের পর জীব যখন মুক্ত হয়, তখন তার স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে অহঙ্কারের কর্ম্ম ঘুচে যায়, কিন্তু ভগবানের শক্তি তখন তাকে আশ্রয় করে কর্ম্ম-রূপে বাইরে ফুটে উঠে।

এই ভাবটাই তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তিবাদে প্রচার করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সাধক-সমাজে শঙ্কর-মতের প্রতিষ্ঠা কখনও ভাল করে হয় নি। এমন শস্য-শ্যামলা সোনার দেশে প্রকৃতির পূজা না হওয়াই অস্বাভাবিক। ভগবান যে শুধু নির্গুণ আর নিরাকার, এ কথা স্বীকার করতে বাঙ্গালীর প্রাণ কেঁদে উঠে। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন অনেক দিন ধরে বেদান্তের টীকা-টিপ্পনি

ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্ম নিরাকার, তখন শ্রীচৈতন্য শুধু জগতের দিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ব্রহ্ম যদি নিরাকার, তো এ সব আকার কার ?" অমূর্ত্তই যে রূপের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে অনন্ত ভাবে আপনার লীলা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে—এইটাই বাঙ্গালী শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই প্রাণের কথা। রূপকে সে বাদ দিতে চায় না, ছেঁটে ফেলতে চায় না। প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তেও তার প্রবৃত্তি নেই।

নিত্যানন্দের পর থেকে বাংলায় শাক্ত আর বৈষ্ণব সাধন-প্রণালী সম্মিলিত করে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, তাদের সকলেরই মধ্যে জ্ঞান, প্রেম আর কর্ম্মের বেশ একটা সমন্বয় চেষ্টা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু সাধন-প্রণালীগুলো মেলাবার তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। আমার এক বন্ধু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন—"দেখ, দক্ষিণীরা যেমন তরকারী রাঁধবার সময় আলু, পটল, বেগুণ সব আলাদা রাঁধে, এক সঙ্গে মিশিয়ে একটা তরকারী করতে পারে না, ওদের সাধন-প্রণালীগুলোও সেই রকম। এক একটি পন্থা যেন এক একটি air-tight compartment ! ওদের দ্বারা ধর্ম্মের সমন্বয় হবে না।"

কথাটা ভেবে দেখবার যোগ্য বটে! প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের, সংসারের সঙ্গে ভগবানের, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে বিচার অনেক দিন থেকেই চলছে। সাংখ্যকার দু'টোকে

নিত্য বলে স্বীকার করলেও দুটোকে কেটে-ছেটে আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাই দিয়ে গেছেন। শঙ্করের বেদান্ত প্রকৃতিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত। বাংলার তন্ত্রই শুধু উভয়ের মৌলিক একত্ব স্বীকার করে সংসারের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাংলার সাধকেরা প্রকৃতিকে পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন বলেই ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পান নি। তাঁদের কেষ্ট যখন বাংলায় এসেছিলেন, তখন বোধ হয় একাই এসেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী তাঁর পাশে শ্রীরাধাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তবে তাঁকে ঘরে তুলে নিয়েছে। শুধু পাশে দাঁড় করিয়েছে বল্‌লে ভুল হবে। বাংলার কবি অরূপকে রূপের কাছে নত করে, কৃষ্ণকে রাধার পায়ে ধরিয়ে তবে ছেড়েছেন। শিব তো বাংলায় একেবারে মহাকালীর পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়েছেন।

আজ-কাল কেউ কেউ বলছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা নাকি নিরীশ্বরবাদী materialist হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার এক এক সময় মনে হয়, ওটা আর কিছুই নয়—মহাত্মাজীর রামরাজ্যের বিরুদ্ধে reaction মাত্র। জানই তো, মা জানকীকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মাতৃভক্ত বাঙ্গালী তাই রামচন্দ্রকে প্রণাম করলেও কখনও প্রাণভরে ভালবাসতে পারলে না। রামের পূজা বাংলায় নেই বললেই হয়। আজকালকার বাঙ্গালী

ছেলেদের ঐ যে materialism ওটা প্রচ্ছন্ন MATER-ialism। ওটা জড়বাদ নয়—প্রকৃতিবাদ; অন্ধ ভাবে মায়েরই পূজা। যে দিন চক্ষু খুলবে, সে দিন তারা বিদেশীর কাছে শেখা—materialism-এর ভিতর বাংলার চিরদিনের প্রকৃতি পূজাই দেখতে পাবে।

বাঙ্গালীর ছেলে সর্ব্বদাই গোড়ার কথাটি ভাল করে বুঝে তবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে চায়। মাঝে তাদের মনে যে সংশয়-জনিত নৈষ্কর্ম্ম দেখা দিয়েছিল সেটা শুধু প্রাণহীন রাজনীতি চর্চ্চার জের। কৌপীনপরা শিব, নেংটিপরা স্বরাজ, অনশন-ক্লিষ্ট পুণ্য—এসব জিনিষে তাদের মন ভরে না। তারা চায় দেখতে মায়ের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। সংসারে তারা থাকতে চায় কৌপীনধারী বৈরাগীর বেশে নয়, মহামায়ার ঐশ্বর্য্যপুষ্ট রাজবেশে। তাই তারা এমন একটা দার্শনিক মতবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে যা তাদের শক্তিমান্ করে তোলে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী পরের কাছে শোনা কথার ভিতর দিয়ে নিজেরই প্রাচীন সাধনাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে।

শ্রাবণ, ১৩৫২

॥ ১৩ ॥

ভায়া,

বাড়ীতে ফিরে এসে তোমার তিনখানা চিঠি এক সঙ্গে পেলুম। উত্তর না পেয়ে তুমি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছ, তা' বুঝতেই পারছি। কিন্তু ভয় নেই, কাশীর একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আমার হস্তরেখা দেখে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এখনও বারো বৎসর আমাকে সনাতন ভবঘুরে-বৃত্তি অবলম্বন করে এই ধরাধামেই থাকতে হবে। তথাস্তু। বেঁধে মারলে আর উপায় কি ?

কাশীতে একটা বড় মজার খবর শুনে এলুম। এখানে কয়েকজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভৃগু-সংহিতা অনুসারে কোষ্ঠী বিচার করে পূর্ব্বজন্মের আর পরজন্মের কথা বলে দেন, জান তো ? একদিন তাঁদের একজনের কাছে গিয়ে দেখলুম যে, মহাত্মাজী থেকে আরম্ভ করে নেতাজী পর্য্যন্ত—দেশের সমস্ত বড়লোকের কোষ্ঠীই তাঁর কাছে রয়েছে। নেতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হলো না—কি জানি, যদি তিনি বলেন যে নেতাজী ইহলোক ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন ! তা' হলে তো আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লকের একেবারে ভরাডুবি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম মহাত্মাজীর কথা। জ্যোতিষী বল্‌লেন—"মহাত্মাজীর কোষ্ঠী-বিচার তিনি অনেক আগেই

করে রেখেছেন, আর এ বিষয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই নেই —পূর্ব্বজন্মে মহাত্মাজী ছিলেন একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশা। সে সময় তিনি যে ব্রত নিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তা' উদ্‌যাপন করতে পারেন নি। সেই অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করতেই তিনি এবার জন্মেছেন।"

কথাটা শুনে ভক্তি ও বিস্ময়ে আমার চোখ দু'টো ঠেলে বেরুবার উপক্রম করতে লাগলো। একটু সামলে নিয়ে আমি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"মহারাজ! এত দয়াই যখন করলেন, তখন খুলে একবার বলে দিন, মহাত্মাজী পূর্ব্বজন্মে কোন্ বাদশা ছিলেন।" জ্যোতিষী একটু হেসে উত্তর দিলেন—"বললে বিশ্বাস করবেন না, বাবা; কিন্তু মহর্ষি ভৃগু ছিলেন ত্রিকালদর্শী অভ্রান্ত ঋষি। তাঁর ইঙ্গিত মিথ্যা হবার নয়; আর সেই ইঙ্গিত অনুসারে গণনা করে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, মহাত্মাজী ছিলেন পূর্ব্বজন্মে মোগল কুলতিলক আলমগীর বাদশা। হিন্দুনিধনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, আর হিন্দুস্থানকে ইসলামস্থানে পরিণত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বলপ্রয়োগ করেও যখন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, তখন বল প্রয়োগের উপর হলেন তিনি বীতরাগ। প্রবল বৈরাগ্যগ্রস্ত হয়ে তিনি মক্কা যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হলো। হিন্দুদের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে, হিন্দুকুলেই তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হোলো; এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান

বলে তিনি দেখতে পেলেন যে, যে কাজ বল-প্রয়োগের দ্বারা সম্ভবপর হয় নি, ছলে ও কৌশলে তা' সুসম্পন্ন হতে পারে। পূর্ব্ব সংস্কারবলে এবার তিনি হয়েছেন অহিংস মুসলিম-দরদী।"

জ্যোতিষীর কথা শুনে আমার হাড় জ্বলে গেলো। আমি বললুম—"রেখে দিন মশাই, আপনার ভৃগু-সংহিতা। যিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করে আসছেন, প্রেমের দ্বারা যিনি চিরদিন মুসলমানদের প্রাণে হিন্দুপ্রীতি জাগাবার চেষ্টা করে আসছেন, তিনি হলেন কি না আলমগীর বাদশার অবতার। কাশীতে গাঁজার দর কত মশাই?"

রেগে আমি উঠে পড়েছিলুম—জ্যোতিষী আমাকে হাত ধরে বসালেন। হেসে বল্লেন—"কাশীতে গাঁজার দর যা-ই হোক বাবা, দিল্লীতে আফিম যত সস্তা, কাশীতে গাঁজা তত সস্তা নয়। দেখেছো না দিল্লীতে মহাত্মাজীর প্রেমের বাণী শুনতে শুনতে সবাইকার চক্ষু কেমন ঢুলু-ঢুলু করছে। পাকিস্থানী কর্ত্তারা কাশ্মীরে ঢুকে দেশটাকে ছারখার করছে। মদ্দদের মারছে আর মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আর এদিকে পাকিস্থানী কর্ত্তাদের সঙ্গে দিল্লীর অমুসলমান কর্ত্তাদের অতি প্রীতিপূর্ণ উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলছে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, অবস্থা নাকি খুবই আশাপ্রদ! কাশ্মীর আক্রমণের নিন্দা করা

চুলোয় যাক্, বিলাতের ওয়াকিবহাল খবরের কাগজওয়ালারা উপদেশ দিচ্ছেন—যাক্ গে আর গণ্ডগোলে কাজ নেই; কাশ্মীরকে পাকিস্থান আর হিন্দুস্থানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দাও। শান্তিরক্ষা করবার অছিলায় যাঁরা ভারতবর্ষের খানিকটা ভেঙ্গে পাকিস্থান গড়তে রাজী হয়েছিলেন, তাঁরা যদি আবার ঐ শান্তিরক্ষার অছিলায় কাশ্মীরকে ছ'টুকরো করতে রাজী হন, তা' হলে তোমরা যে সবাই সেই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে কংগ্রেসের জয়ধ্বনি করবে তা'তে সন্দেহ নেই; কিন্তু দু'দিন পরে দেখতে পাবে যে, কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্থানে গেল তাতে একজন হিন্দুরও স্থান হবে না।"

আমি বল্লুম—"ধান ভান্তে শিবের গীত কেন? দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে কি করবেন না করবেন, তার সঙ্গে মহাত্মাজীর সম্বন্ধ কি?"

জ্যোতিষী বললেন—"বাপধন! চোটো না। মহাত্মাজী নির্লিপ্ত পুরুষ; তাঁর সঙ্গে জগতের কোন কিছুরই সম্বন্ধ নেই। তিনি কংগ্রেসের চার আনার মেম্বারও নন; অথচ দেখ, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে গিয়ে তিনি বক্তৃতা করছেন। তাঁর ইঙ্গিতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টকেও গদি ছাড়তে হচ্ছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই; অথচ ছোরাউদ্দি সাহেব তাঁর আজকাল একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। হিন্দু মুসলমানকে মিলিয়ে দেবার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই;

কিন্তু মুসলিম লীগ সেই মিলনের বিরোধী জেনেও তিনি কলকাতায় এসে তাঁর অনুগত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুসলিম লীগে যোগ দিতে উপদেশ দিয়ে গেলেন। কাশ্মীরের তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু তবুও যখন পাকিস্থানী কর্ত্তাদের সাহায্যে পাঠানেরা কাশ্মীর আক্রমণ করলো, তখন মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি সেখানে সৈন্যসামন্ত না পাঠিয়ে অহিংস যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন, তা' হলেই কাজটা হতো ভাল। সহিংস যুদ্ধেই যখন পাঠানদের ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে, তখন অহিংস যুদ্ধ করলে যে এতদিনে পাঠানেরা কাশ্মীর দখল করে দিল্লীতে এসে পৌছুতো, তা' মহাত্মাজী ভিন্ন আর সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। পাঠানদের সহিংস আক্রমণ আর ভারত গবর্নমেণ্টের অহিংস প্রতিরোধ —এই দু'য়ের সংঘর্ষে যদি পাকিস্থানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে যায়, তাতে মহাত্মাজী আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং প্রীতই হবেন—লোকে যদি এ কথা মনে করে তা' হলে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়?"

কথাগুলো আমার ঠিক ভাল লাগছিল না; কিন্তু জ্যোতিষীর মুখ বন্ধ করার পথও খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যোতিষী যেন একটু উৎসাহিত হয়েই আবার বল্‌তে লাগলেন—"আর এই আশ্রয়-প্রার্থীদের ব্যাপারটাই দেখ না! পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ হিন্দু আর শিখ সর্ব্বহারা হয়ে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে এসে পড়েছে;

আর প্রায় সমানসংখ্যক মুসলমান দিল্লী পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ছেড়ে পাকিস্থানে চলে যেতে চাইছে। মহাত্মাজী হিন্দু আর শিখদের উপদেশ দিচ্ছেন—'তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ফিরে যাও,' আর মুসলমানদের মধ্যে বন্ধু ভাবে বাস করো গে। মুসলমানেরা যদি তোমাদের খুন করতেও চায়, তা' হলেও ভয় পেও না। 'যেহেতু আত্মা অমর।' দিল্লী আর পূর্ব্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের তিনি বলছেন—'তোমরা দেশ ছেড়ে যেও না। ভারত গবর্নমেণ্ট প্রাণপণে তোমাদের রক্ষা করবে।' এর ফল হচ্ছে এই যে, যে-সব হিন্দু আর শিখ পাকিস্থান থেকে এসেছে, তারা মহাত্মাজীর উপদেশ সত্ত্বেও পাকিস্থানে ফিরে যেতে চাইছে না। তাদের বিষয় সম্পত্তি যে তারা ফিরে পাবে সে আশা তাদের নেই; আর এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পাকিস্থানে ফিরে গিয়ে বাস করতে হলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের কলমা পড়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। মহাত্মাজী আশ্বাস দিচ্ছেন যে, ভারতবর্ষে যদি মুসমলানদের উপর কোনরকম অত্যাচার না হয়, তা' হলে পাকিস্থানেও হিন্দু আর শিখদের উপর সব অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে—আজ পঁচিশ বৎসর ধরে মহাত্মাজী মুসলিম লীগকে তুষ্ট করবার জন্যে তাদের সব আবদার মেনে নিয়েছেন; ভারতবর্ষে মুসলমানদের উপর কোন অত্যাচারই হয় নি; কিন্তু তবু পাকিস্থানী লড়াই সুরু হলো কেন? হিন্দু

আর শিখ শান্ত হয়ে থাকবে, তার তো কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না! বরং তারা যে উৎসাহিত হয়ে আরও বেশী অশান্ত হয়ে উঠবে, অতীত ঘটনা থেকে তা-ই মনে হয়। মহাত্মাজীর পন্থা অনুসরণ করে যদি হিন্দু-মুসলমানে মিলন করাতে হয়, তা' হলে শেষ পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতীত ইতিহাস অনুসরণ করে কতক হিন্দু কলমা পড়ে প্রাণ বাঁচাবে; আর যারা তা' করবে না, তাদের অমর আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে পিতৃলোকে বিচরণ করতে থাকবে। শ্রাদ্ধ-তর্পণের সময় এক গণ্ডুষ জলের আশায় তারা হাঁ করে বসে থাকবে; কিন্তু তাদের বংশধরদের ভিতর সেই জল-গণ্ডুষ দেবার লোক আর কেউ থাকবে না!"

পিতৃলোকে গিয়ে হিন্দুদের অমর আত্মার কি অবস্থা হবে, তার জন্যে আমার বেশী দুর্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মহাত্মাজী নিজেই অমর আত্মার কথা তুলেছিলেন; কাজেই সেই অমর আত্মাকে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, তর্ক-যুদ্ধেও aggression is the best form of defence। আমি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে জ্যোতিষীকে বললুম—"মহাত্মাজী না হয় হিন্দুদের শান্ত ভাবে সব অত্যাচার সহ্য করতে বলে মহা অপরাধ করেছেন। কিন্তু আপনি তাদের কি করতে বলেন? একে তো দেশে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব—তার

উপর মারামারি কাটাকাটি যদি লেগে থাকে, তা' হলে আমাদের দুর্দ্দশা বাড়বে বই তো কমবে না। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাবের উপর আবার খুনোখুনি চড়িয়ে দেওয়া কি ভাল ?"

জ্যোতিষী বল্লেন—"আরে কি বিপদ! উপদেশ দেওয়া কি আমার ব্যাবসা ? মানুষের কর্ম্মফলে যা' ঘটছে আর যা' ঘটবে তাই ঠিক করে নির্ণয় করাই জ্যোতিষের কাজ। যে কর্ম্ম আমরা করেছি তার ফল কি হয়েছে; আর যা করতে যাচ্ছি তার ফল কি হবে ? —এই সব কথা নিয়েই আমার কারবার। লোককে সুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি দেবার কর্ত্তা তো আমি নই। যারা যেমন বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে তারা সেই অনুসারেই চলবে; আর যার উপদেশ শুনলে তাদের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, তার উপদেশই শুনবে। মহাত্মাজী জন্মেছেন নিজের কর্ম্মফলে মহাত্মা হয়ে, আর এ দেশের হিন্দুরাও জন্মেছে নিজেদের কর্ম্মফলে এ দেশের হিন্দু হয়ে। এই দু'য়ের সংস্পর্শে হিন্দুস্থান যদি পাকিস্থানে পরিণত হয়, তাহলে রোধ করবার আমি কে ? মহাত্মাজী সফল হবেন, কি নিষ্ফল হবেন তা' নির্ভর করছে এ দেশের লোকের উপর। তারা কি করবে তা' নির্ভর করছে তাদের অতীত কর্ম্মফলপ্রসূত বুদ্ধি-বিবেচনার উপর। মহাত্মাজী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন্ পথে চলছেন, মহর্ষি ভৃগুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তা' দেখিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। বিশ্বাস করা না করা তোমার খুসী।"

বা রে জ্যোতিষী! মহাত্মাজীকে ঔরঙ্গজেব বাদশার অবতার বানিয়ে দিয়ে একেবারে পাঁকাল মাছটির মতো পিছলে পড়বার চেষ্টা করছেন! আমি বললুম—"দেখুন, জ্যোতিষী ঠাকুর! মহাত্মাজী সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ। হিন্দু-মুসলমান প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বাস করুক—এই তাঁর আন্তরিক কামনা।"

জ্যোতিষী একটু হেসে বল্‌লেন—"এই কথাই তিনি বলেন বটে; কিন্তু কোথাও দেখেছ তিনি মুসলমানদের কাছে অমর আত্মা সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছেন? কোথাও তাদের বলেছেন, শত্রুর ছুরির সামনে বুক পেতে দিতে? কোথাও কি তাদের মেয়েদের তিনি বিষ খেয়ে মরতে উপদেশ দিয়েছেন? শুধু হিন্দুর আত্মাই কি অমর? শুন্‌তে পাই, মুসলমানদের জন্যে বেহেস্তে না কি রকম-বে-রকমের মোগলাই কালিয়া-পোলাও, আর হুরি-পরির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং হিন্দুরা পিতৃলোকে গিয়ে যে অবস্থায় থাকবে মুসলমানেরা বেহেস্তে গিয়ে তার চেয়ে ভালই থাকবে বলে মনে হয়। কিন্তু তবুও মহাত্মাজী কোথাও তো মুসলমানদের বিনা বাক্যব্যয়ে বেহেস্তে চলে যাবার উপদেশ দেন নি? কেন বল দেখি?"

না, এ জ্যোতিষীকে নিয়ে আর পারা গেল না। হঠাৎ আমার মনে হলো, বেটা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের গুপ্তচর নয় তো? বাংলা দেশ হলে আমাদের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী

অতি সহিংস ভাবে বেটাকে জেলে পুরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন। কিন্তু কাশীতে তো তা' হবার উপায় নাই! ঠিক করলুম, দেশে ফিরেই ব্যাপারটা আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে জানিয়ে দেবো। মহাত্মাজীর কাছে খবর পাঠিয়ে তাঁরা এই পাষণ্ড দলনের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

সুভাষচন্দ্র

॥ ১ ॥

ভায়া হে,

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে বলে তুমি আমাকে মহাবিপদে ফেলেছ। যখন সুভাষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তখন মনে করতুম তার অনেকটাই আমি জেনেছি, বুঝেছি। এখন আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি তাঁর শক্তি নির্ণয় করবার সামর্থ্য আমার এখনও নেই, কোনদিনই ছিল না। সুভাষ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আলোচনা করবার সময় আমরা অনেক সময় বলতুম—that man will go very far—বহুদূর পর্য্যন্ত সে ছুটবে; এতদূর যে সে ছুটবে, তা' কোন দিনই কল্পনা করতে পারি নি।

প্রথম যখন সুভাষের সঙ্গে দেখা হয় ১৯২১ সালে তখন আমরা আন্দামান থেকে ফিরে এসে 'নারায়ণ' আর 'বিজলী' চালাচ্ছি। সুভাষ তখন আই, সি, এস হবার মোহ কাটিয়ে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের কাছ থেকে সুভাষের গল্প প্রায়ই শুনতুম। সুভাষের সাধু হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবকে ঠ্যাঙ্গানি, তার puritan চাল-চলন—কত গল্পই না হতো! সুভাষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

আমরা ছিলাম কংগ্রেসী দলের বাইরে; কাজেই দেখা-শুনা হবার বাধাও একটু ছিল।

'বিজলী'তে তখন প্রতি সপ্তাহেই মহাত্মাজী আর তাঁর অসহযোগ-আন্দোলনকে মহা ফূর্ত্তিসে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছি। ঐ অহিংস যুদ্ধের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা আমি কস্মিন কালেই হজম করে উঠতে পারি নি। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখি, বন্ধু হেমন্তকুমারের সঙ্গে তিনজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। ছেঁড়া মাদুরের উপরই তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। ক্রমে পরিচয় হলো। একজন হচ্চেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গরীবের ছেলে; তবু মোটা মাইনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে জয় মা বলে অসহযোগের তরঙ্গে তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। অতি শান্ত ও বিনীত। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সুরেশ ব্যানার্জ্জি। ডাক্তার মানুষ—প্রফুল্লবাবুর মতই সর্ব্বত্যাগী। প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তৃতীয় ভদ্রলোকটি—ভদ্রলোক বলা মিছে—একেবারে বাচ্ছা বল্‌লেই হয়। দিব্যি ফুটফুটে গৌরবর্ণ; ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি। মুখ-চোখ উজ্জ্বল। বন্ধু হেমন্তকুমার পিছন থেকে চুপি চুপি বলে দিলেন—ঐ সুভাষ।

ওঁরা এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। কেন আমরা অসহযোগ আন্দোলনের খুঁত ধরি—কেন আমরা অহিংসার কথা শুনে বিদ্রূপ করি।

সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে তর্ক চল্‌লো রাত একটা পর্য্যন্ত। অসহযোগের পক্ষ নিলেন প্রধানতঃ প্রফুল্লবাবু আর সুরেশবাবু। সুভাষ শুধু শুনছিল, আর মাঝে মাঝে হাসছিল। শেষে প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"সারা দেশ যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়, তা' হলে গবর্ণমেণ্ট ভেঙ্গে পড়বে না কেন?"

আমি বললুম, "ভেঙ্গে পড়বে না এই জন্য যে, ইংরেজ আপনাদের মতো অহিংস নয়। সে আপনাদের ক্ষেতের ধান লুট করে নিয়ে আপনাদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙ্গানি দেবার ব্যবস্থা করবে। দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবে। তখন হয় পুনর্মূষিক হতে হবে, নয় তো মারা পড়তে হবে। কোন দিকেই ইংরেজের ক্ষতি নেই।"

তর্কের ফল হলো এই—আমাদের মত ও তাঁরা মেনে নিলেন না; আমরাও তাঁদের মত মেনে নিলুম না। অনেক রাত হয়ে গেছে। যখন সভা ভঙ্গ হলো, তখন সুভাষ বললে আস্তে আস্তে—দেখাই যাক দিনকতক! সত্যিই কি আর একেবারে অহিংস হয়ে গেছি!

* * *

অসহযোগ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল চৌরিচৌরার সঙ্গে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স থামিয়ে দিয়ে মহাত্মাজী ঠিক কাজ করলেন কি ভুল করলেন তা' নিয়ে বাংলা দেশে মতভেদ বেশ প্রবল হয়ে উঠলো। অনেকের

মনে হলো ক্ষণিক উত্তেজনার পর দেশটা যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কি করে লোকের মন চাঙ্গা করে রাখা যায় তা' নিয়ে নেতাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা গেল। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স এন্‌কোয়ারি কমিটি (Civil Disobedience Enquiry committee) বসলো। তাঁরা রায় দিলেন যে, দেশের লোক এখনও প্রস্তুত হয় নি ; অতএব আপাততঃ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, ব্যবস্থাপক সভাগুলোর ভিতর থেকে গবর্ণমেণ্টকে নানা রকমে অতিষ্ঠ করে তোলবার চেষ্টা করা হোক। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি প্রবল হয়ে উঠল। এক দিকে রইলেন বিশুদ্ধ খদ্দর-পন্থী নৈষ্ঠিক অসহযোগীর দল ; অপর দিকে খাড়া হলেন স্বরাজ্য দল। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন হলেন স্বরাজ্য দলের নেতা, আর সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁর প্রধান লেফ্‌টেনাণ্ট।

'বিজলী' কাগজখানি তখন উঠে গিয়েছিল নানা কারণে। মহাত্মা-পন্থী অসহযোগীদের উপর তখন আমি বিষোদ্‌গার করছিলুম 'আত্মশক্তি'র ভিতর দিয়ে। কতকগুলো লেখা ভাল লেগেছিল দেশবন্ধুর ; আর সেই সূত্র অবলম্বন করে আমি ক্রমশঃ গিয়ে পড়লুম স্বরাজ্য দলের মধ্যে। বৌবাজারের চেরি প্রেসে ছাপা হতো 'আত্মশক্তি' ; আর সেই খানেই প্রতিষ্ঠিত হলো স্বরাজ্য দলের প্রধান আড্ডা। সেই-সময় সুভাষচন্দ্রকে একটু ভাল করে জানবার অবসর

পেয়েছিলুম। কেমন করে গান্ধী-পন্থীদের হাত থেকে বাংলার কংগ্রেসটাকে উদ্ধার করা হবে, কেমন করে সমস্ত দেশটার শক্তি সংঘবদ্ধ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঘায়েল করা যেতে পারে—এই সব নানা প্রসঙ্গের আলোচনা সুভাষের সঙ্গে দিন-রাতই চলতো।

* * *

দেখলুম, সুভাষের মনে ঐ এক দেশের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই, ছিল না। এমন অক্লান্ত কর্ম্মী আর দেখি নি। বাংলা দেশের অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব একটু ঢিলে-ঢালা রকমের। সব কাজেই একটু হচ্চে-হবে ভাব। সুভাষের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজীতে যাকে বলে Bull-dog tenacity তা সুভাষের ছিল পুরোমাত্রায়। একটা কাজ হাতে নিলে শেষ না করে ছাড়তো না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই—কাজ চলেছে। অপরকে এগিয়ে পড়তে দেখলে সে একেবারে ক্ষেপে যেত। রাগে, অভিমানে ফুলতো। এক-এক সময় ছেলে মানুষের মতো কেঁদেও ফেলতো। সবাই যখন জেলে যাচ্ছে তখন দেশবন্ধু সুভাষকে জেলে যাবার অনুমতি দেন নি বলে সুভাষ কেঁদেই অস্থির। দেশবন্ধু হাসতে হাসতে তার নাম দিয়েছিলেন—our crying captain !

* * *

সব কাজেই সুভাষের নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। ন্যাশনাল

কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সুভাষ ছিল তার প্রিন্সিপ্যাল। বেঞ্চি সাজানো থেকে আরম্ভ করে ছেলেদের পড়ানো পর্য্যন্ত সব কাজেই তার সমান উৎসাহ। পাই পয়সা পর্য্যান্ত হিসাব ঠিক রাখতে এক-একদিন গভীর রাত্রি হয়ে যেত। সেদিকে সুভাষের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব কাজ শেষ না করে সে উঠবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। ক্রমে ছেলেদের উৎসাহ কমে গিয়ে যখন তারা একে একে সরে পড়লো, তখনও সুভাষ অচল, অটল! সুভাষকে একদিন সেখানে খুঁজতে গিয়ে দেখি বন্ধুবর কিরণশঙ্কর নীচের তলায় কাগজ পড়ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম—"সুভাষ কোথায়?" কিরণবাবু হেসে জবাব দিলেন—"সুভাষ! সে তার ক্লাসে বেঞ্চিগুলোকে পড়াচ্চে।" উপরে গিয়ে দেখি—ক্লাসে ছাত্র নেই; সুভাষ আসনের উপর সোজা হয়ে বসে নিশ্চিত মনে লিখচে। ছেলেরা নাই বা এলো! তার নিজের কর্ত্তব্য তো তাকে করতে হবে!

সন্ধ্যার একটু আগে সুভাষের কাজ শেষ হলো। তখন ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তাদের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের মনান্তর হয়েছে। ছেলে-মহলে রব উঠেছে—ট্রামগাড়ী বয়কট করো। কাজে কাজেই সুভাষও ট্রামগাড়ীতে চড়বে না। হাতীবাগান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চললো ভবানীপুরে। চৌরঙ্গীর কাছাকাছি গিয়ে বল্‌লে—"চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।" আমাকে

আসতে হবে শ্যামবাজারে। সুভাষ আবার হাতীবাগানের কাছে এসে পড়লো। আমি দেখলুম, এই পাগলের পাল্লায় পড়ে যদি পরস্পরকে এগিয়ে দেওয়া-দেওয়ি করতে থাকি, তা' হলে রাস্তাতেই সারা রাত কেটে যাবে। আমি বৌবাজার পর্য্যন্ত ফিরে এসে সুভাষকে বল্‌লুম—"যাও, ভাই, বাড়ী গিয়ে শোওগে। আজকের মতো ভারতমাতাকে একটু বিশ্রাম দাও।"

*　　　*　　　*

সুভাষের মত কষ্টসহিষ্ণু ছেলে খুব কমই দেখেছি! A. I. C. Cর অধিবেশনে যোগ দিতে তখন অনেকবার নাগপুর, বোম্বাই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গুড়ের নাগরীর মতো ঠাসাঠাসি করে সবাই চলেছি। খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা কিছুরই ঠিক নেই; কিন্তু সুভাষের মুখে কখনও বিন্দুমাত্র কষ্টের বা বিরক্তির চিহ্ন দেখতে পাই নি। বাংলা দেশে দেশবন্ধু তখন স্বরাজ্য-দল গড়ে তুলছেন। সুভাষ তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরাতন বিপ্লব-বাদীদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খদ্দরের টুপি মাথায় এঁটে রাতারাতি প্রচণ্ড অহিংসবাদী হয়ে পড়ে-ছিলেন। সুভাষের ইচ্ছা বিপ্লববাদীরা যখন পুরাতন পন্থা ছেড়ে দিয়েছে, তখন তারা স্বরাজ্য দলে যোগ দিক। তিনি দেশবন্ধুকে সেই পরামর্শ দিলেন। দেশবন্ধু সকলকে ডেকে বল্‌লেন—"অহিংসা আমার আদর্শ বটে; তবে গান্ধীজীর

মতো আমি অহিংসা-খোর নই। আর চরকা যারা কাটছে কাটুক। চরকা কাটলে সূতো হয়, সূতো থেকে খদ্দর হয়, সবই বুঝি, কিন্তু খদ্দর থেকে যে কি করে স্বরাজ হবে, তা বুঝি নে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স উঠে গেল; অথচ কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার ভিতর কোথাও একটা Spirit ot resistance-এর লক্ষণ নেই। ঐ resistance-এর ভাবটা যদি মরে যায়, তা' হলে আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাউন্সিলে গেলে সেই ভাবটা বাঁচিয়ে রাখতে পারা যাবে; আর তা' থেকে দরকার হলে সিভিল ডিসো-বিডিয়েন্সও আরম্ভ করা যেতে পারবে।"

বিপ্লববাদীরা সে কথা মেনে নিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, policy হিসাবে তাঁরা অহিংসাটাকে আপাততঃ মেনে নেবেন।

সুভাষচন্দ্রের মহা স্ফূর্ত্তি। স্বরাজ্য দলের কর্ম্ম-পন্থা প্রচার করবার জন্যে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। একরকম জোর করেই আমাকেও ধরে নিয়ে গেলেন। মতলবটা তখন ঠিক ধরতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিলুম। সুভাষের ইচ্ছা ছিল, স্বরাজ্য দলের ভিতর এমন একটা inner circle গড়ে তোলা যাদের লক্ষ্য শুধু কাউন্সিল বা আনুষঙ্গিক কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এবং যারা ক্রমশঃ সমস্ত কংগ্রেসটাকে একটা বিপ্লবী সঙ্ঘে পরিণত করতে পারবে।

অসহযোগ-আন্দোলন দুই-একবার বিফল হলেই কংগ্রেসের নেতারা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলতে চেষ্টা করবেন, সে সন্দেহ সুভাষের মনে তখন থেকেই গজিয়েছিল।

বিপ্লববাদী নেতাদের মধ্যে দুই-একজন কংগ্রেসে যোগ দেন নি! তাঁরা policy হিসাবেও অহিংসাটাকে মেনে নিতে রাজী হন নি। তবে তাঁরা কিছুদিনের জন্য কোন রকম terrorist কাজ-কর্ম্মের ভিতর যাবেন না, এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁদের দলের ছেলেরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁদের কাজকর্ম্মের ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট সব পুরাতন বৈপ্লবিকদের ধরে জেলে পুরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যেতে হলো। তবে সুভাষের উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে নি দেখে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম।

* * *

বৃথা আশা! এক বৎসর যেতে না যেতেই দেখলুম সুভাষচন্দ্র ও আরও কয়েকজন স্বরাজ্য দলের পাণ্ডাদেরও গবর্ণমেণ্ট জেলে পুরলো। সুভাষ তখন কলকাতা করপোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁকে জেলে পুরে জেলের কর্ত্তারা বিব্রত হয়ে উঠলেন। কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে চিফের মতামত নেবার জন্যে করপোরেশনের চিফ এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীদের মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে

সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে হতো। সাক্ষাতের সময় দুই-একজন সি, আই, ডি ইন্সপেক্টরকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হতো; খদ্দর-পরা সুভাষচন্দ্র চেয়ারে গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট, আর হ্যাটকোটধারী চিফ এঞ্জিনীয়ার কোট্‌স্ সাহেব চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে খাতা-পত্র দেখাচ্ছেন। সি, আই, ডি ইন্সপেক্টরদের সে দৃশ্য দেখে কি স্ফূর্ত্তি! সাক্ষাৎ শেষ হয়ে যাবার পর একজন বললেন—"ঠিক হয়েছে! মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, আর মামারা আমাদের উপর তম্বি করেন। সুভাষ মামাদের ঠিক সায়েস্তা করেছে! এখন দাঁড়িয়ে থাকো বাবা —সুভাষের সামনে টুপি খুলে, আর বলো—Yes Sir."

সি, আই, ডি-দের উপর সুভাষের আন্তরিক ঘৃণা ছিল। একদিন করপোরেশনের একজন কর্ম্মচারী সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুভাষ তাঁকে যে সমস্ত প্রশ্ন করছিলেন, তার সব কথাগুলো সি, আই, ডি, অফিসারটি বুঝতে পারছিলেন না। অথচ বুঝতে না পারলে গবর্ণমেণ্টের কাছে ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়াও চলে না। তিনি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওটা কি বল্‌লেন, স্যার?" সুভাষ সে কথার জবাবও দিলেন না। তার দিকে ফিরেও দেখ্‌লেন না। খানিকক্ষণ পরে আবার ঐ একই প্রশ্ন হলো। সুভাষ কিছু না বলে তার দিকে শুধু একবার কট্‌মট্‌ করে চেয়ে দেখলেন। তৃতীয়বার আবার প্রশ্ন হলো—"ওটা কি

বললেন, স্যর ?” সুভাষ হাতের কলমটি রেখে দিয়ে সি, আই, ডি প্রভুকে বল্‌লেন—“You just shut up.” সি, আই, ডি ইন্‌স্‌পেক্টর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়ে কর্ত্তাদের কাছে নালিশ করলেন। সুভাষকে আলিপুর জেল থেকে বদলী হয়ে যেতে হলো বহরমপুর, তারপর একেবারে মান্দালয়।

* * * *

জেল থেকে সুভাষ যখন ছাড়া পেলেন তখন দেশবন্ধু পরলোকে। বাংলার কংগ্রেস তখন স্বরাজ্য দলের হস্তগত; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট নিয়ে মতভেদ হওয়ায় আমি ক্রমশঃই ঐ দল থেকে দূরে সরে এসেছিলাম। সুভাষ জেল থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর সঙ্গে সেনগুপ্ত সাহেবের মতভেদও প্রবল হয়ে উঠেছিল। দূর থেকে আমি সব সময় বুঝতে পারতুম না, সুভাষ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন কেন। আমার মতো অনেকেই হয় ত' তাঁকে ভুল বুঝেছিল। অনেক সময় তীব্র ভাবে তাঁর কাজের সমালোচনাও করেছি। আজ মনে হয় যেন বুঝতে পেরেছি সুভাষ কি খুঁজছিলেন। বাংলাদেশের দলাদলির ভিতর যা' করা সম্ভব হয় নি, বাংলার আবহাওয়ার বাইরে গিয়ে তা' সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। Too late. (ক্রমশঃ)

মাঘ, ১৩৫২

॥ ২ ॥

গত বারে সুভাষ সম্বন্ধে যা' লিখেছিলুম তার তলায় তোমরা ছোট করে একটা 'ক্রমশঃ' জুড়ে দিয়ে আমায় বিষম ফ্যাসাদে ফেলেছ। পাক দিয়ে সূতো লম্বা করবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। লোকের কৌতূহলের যে শেষ নেই তা' জানি, কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার চিন্তার ধারা যে একেবারে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! বেশ গম্ভীর হয়ে লিখতে বসেছি; সুমুখে যোদ্ধৃবেশে সুভাযের ফটো। কিন্তু লিখবো কি ছাই? আমার কেবলি মনে হচ্ছে— O fairest flower, no sooner blown but blasted! কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত তেজ ঐ চোখের ভিতর পোরা রয়েছে। সবই কি শূন্যে মিলিয়ে গেছে? সত্যই কি সুভাষ আজ ইহজগতে নেই?

মহাত্মাজীর আদর্শে আস্থাবান্ হবার সৌভাগ্য যে আমার কখনও হয় নি, তা' তোমরা বেশ করেই জান। অধিকন্তু, মহাত্মাজী সুভাষের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যে আমার মনের কোণে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বেশ খানিকটা বিদ্বেষ যে জমা হয়ে আছে, তা' নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। মহাত্মাজী যখন বলেন যে সুভাষ-সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের মহান নিয়মানুবর্ত্তিতা, স্বদেশ প্রেম,

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সবই তাঁর কাছে প্রশংসনীয়, কেবল তাঁদের যুদ্ধ-স্পৃহাটার ভিতর তিনি অমঙ্গলের বীজ দেখতে পান তখন আমার হাসিও পায়, রাগও ধরে। আমার মনে হয়, যতগুলি সদ্‌গুণের তিনি উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলিই ঐ যুদ্ধ-স্পৃহাকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠেছে। ঘড়ির ভিতর থেকে হেয়ার-স্প্রিংটি আস্তে আস্তে টেনে বের করে নিলে ঘড়িব যে অবস্থা হয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিতর থেকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার স্পৃহাটুকু বাদ দিলে মহাত্মাজী যে সমস্ত সদ্‌গুণের প্রশংসা করেছেন সেগুলি একে একে সবই লোপ পাবে। তা' হোক, মহাত্মাজী সুভাষ সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, যে-দিন সভাস্থলে তিনি বলেছেন—"I repeat—Subhas is alive—" সেদিন আমার মনে হয়েছিল বুড়োকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে গা-ময় মাখি। মুখে তাঁর ফুল-চন্দন পড়ুক। একশো পঁচিশ বৎসর কেন, তিনি চিরজীবী হয়ে রামরাজ্যের মহিমা প্রচার করতে থাকুন।

আজকাল এক এক সময় কি মনে হয়, জানো?—মনে হয়, আহা! সুভাষের যদি একটা ছেলে থাকতো। কিন্তু তা' তো হবার নয়। সুভাষ ছিল একবারে আকাট ব্রহ্মচারী। তার ধারণা ছিল এ যুগে যে স্বদেশ উদ্ধার করতে যাবে, তাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিতে হবে দেশমাতৃকার চরণে। তার ভক্তি, ভালবাসার আর অন্য ভাগীদার থাকা চলবে না।

মেয়েরা দলে দলে দেশের কাজে নেমে পড়ুক, এটা সে সর্ব্বান্তঃকরণে চাইতো, আর এ বিষয়ে তাদের উৎসাহ দিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হতো না। নারী-জাগরণ বলতে সে বুঝতো মেয়েরা ছেলেদের মতো লেখা-পড়া শিখবে, সভা-সমিতিতে যোগ দেবে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুরুষদের অগম্য স্থানে স্বদেশপ্রেম প্রচার করবে, স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে কুচকাওয়াজ করবে, আর্ত্তের সেবা করবে—ব্যস! এ ছাড়া কোমল সুরের আর কিছু দেখলে বা শুনলে সুভাষ অবাক হয়ে যেত, বিরক্ত হতো। তার মুখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠত।

১৯২৩ সালে যখন দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্যদলের কার্য্য-প্রণালী প্রচার করবার জন্যে মৈমনসিংহে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দলের ভিতর সুভাষও ছিল; আমিও ছিলাম। তখনকার No-changer দলের মৈমনসিংহ ছিল একটা প্রধান আড্ডা। দেশবন্ধুর কাউন্সিল দখল করার প্রোগ্রামের উপর লোকের বেশী আস্থা ছিল না। No changerদের ঐ কেল্লাটি দখল করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। আক্রমণের বেগ প্রবাহিত হতে লাগলো ত্রিধারায়। স্বয়ং দেশবন্ধু সেখানকার উকিলদের নিয়ে পড়লেন; আমি ঢুকে পড়লুম পুরাতন বিপ্লবপন্থী দলের ছেলেদের ভিতর; আর মৈমনসিংহের নৈষ্ঠিক অসহযোগপন্থী নারীবাহিনীকে তর্কযুদ্ধে বিধ্বস্ত করে দেবার ভার পড়লো সেনাপতি সুভাষচন্দ্রের উপর।

মহা উৎসাহে মেয়েদের এক সভা ডাকা হলো। সুভাষ আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবেই। আমি করজোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন করলুম—"ভাই, মেয়েদের যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কেউ কিছু বোঝাতে পেরেছেন, এ বিশ্বাস আমার নেই। তবে তোমার সাহসের অন্ত নেই। ও কাজটা তুমিই চেষ্টা করে দেখ।" সুভাষ রেগে গিয়ে বল্‌লে—"মেয়েদের কাজে আপনার কখ্‌খনো উৎসাহ দেখতে পাই নে। আপনি কি মনে করেন, মেয়েরা না এলে দেশের কাজ এগুবে?" আমি আরও বিনীত ভাবে বল্‌লুম—"তুমি ভুল বুঝছ ভাই, মেয়েদের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাঁরা বেড়ি-খুন্তি নিয়ে রণক্ষেত্রে না এগুলে আমাদের যে শুকিয়ে মরতে হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।"

সুভাষ মুখখানা খুব গম্ভীর করে চলে গেল।

* * *

সভায় না যাবার একটা কারণ ছিল তা' সুভাষের কাছে ভেঙ্গে বলি নি। আমি খবর পেয়েছিলুম যে, যে বন্ধুর বাড়ীতে আমরা অতিথি হয়েছিলুম তাঁর স্ত্রী-ই হচ্ছেন ওখানকার মেয়েদের নেত্রী। শিক্ষিতা আর বুদ্ধিমতী বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, সুভাষের মেয়েদের মিটিং-এ তিনি যান নি। হেঁসেল কোণে অতিথিদের ভূরি ভোজনের আয়োজন নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমি

ঠিক করেছিলুম যে, মেয়েদের সহানুভূতি যদি পেতে হয়, তা' হলে হেঁসেলঘরের এই বৌ-ঠাক্‌রুণটির শরণাপন্ন হতেই হবে। কি করে তাঁর কাছ থেকে অভয় পাওয়া যায়, আমি আহারাদির পর শুয়ে শুয়ে সেই চিন্তাই করতে লাগলুম।

ভগবান সদয়—। সুযোগ মিলতে বেশী বিলম্ব হলো না। ঐ বাড়ীরই একটি ৬।৭ বছরের মেয়ে কি জানি কি মনে করে আমার কাছে এলো। আমি তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তারা কয় ভাই, কয় বোন তাকে কে বেশী ভালবাসে—তার মা, না বাবা—তার গলায় ঐ দাগটা কিসের প্রভৃতি নানা প্রশ্ন করে যে জ্ঞান সঞ্চয় করলুম, তার উপর নির্ভর করে সামুদ্রিক-বিদ্যার পরীক্ষা দিতে বেশী কষ্ট হয় না।

তারপর আমি দেখতে আরম্ভ করে দিলাম, তার হস্তরেখা। কোথায় তার বিয়ে হবে, তার বরটি দেখতে কেমন হবে—এই সব পরম গুহ্যতত্ত্ব যখন অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ভিতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগলাম, তখন মেয়েটি তো একেবারে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার মা-ঠাক্‌রুণটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। বাটনা-টাটনা বাঁটছিলেন বোধ হয়—হাতে হলুদের দাগ। বাঁ হাতখানা আমার কাছে এগিয়ে দিলেন—"আপনি দেখছি সামুদ্রিক-বিদ্যা-বিশারদ। আমার হাতখানা একবার দেখুন দেখি।" আমি মনে মনে বল্‌লুম—"এই যে মাছ টোপ গিলেছে।" মুখে

বল্‌লুম—"না, বৌ-ঠাক্‌রুণ; ও-সব আমি কিছু জানি নে।" বৌ-ঠাক্‌রুণ সে কথা শুনলেন না। বল্‌লেন—"খুকীকে আপনি যা' যা' বলেছেন, সব মিলে গেছে। আমার হাত আপনাকে দেখতেই হবে।"

দেখতেই যখন হবে, তখন শ্রীগুরু স্মরণ করে দেখতে আরম্ভ করলুম। হুঁ। স্বাস্থ্য-রেখা কিঞ্চিৎ অপরিস্ফুট। আপনার শরীরটা তো আজ-কাল ভাল নেই—না? (বলা বাহুল্য, মুখ দেখলেই তা' বুঝতে পারা যায়, সামুদ্রিক-বিদ্যার প্রয়োজন হয় না)। বৌ-ঠাক্‌রুণ বল্‌লেন—"হাঁ, প্রায় আট-ন'মাস হলো শরীরটা সারছে না।" কাছে দোলনায় একটি ছোট মেয়ে ঘুমুচ্ছিল; অনুমান করলুম তার বয়স আট-নয় মাসের বেশী হবে না। আর তাঁকে বেশী কিছু বলতে হলো না। আমি অন্তর্নিহিত সামুদ্রিক-বিদ্যার প্রভাবে গড় গড় করে সব বলে যেতে লাগলুম।

তারপর দেখলুম—বিদ্যার রেখা, বুদ্ধির রেখা, ধনের রেখা, নেতৃত্বের রেখা। বৌ-ঠাক্‌রুণের মুখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগলো। এমন সময় মস্‌-মস্‌ করতে করতে আদালত থেকে ফিরে এলেন আমাদের উকিল গৃহস্বামী। আমি হাত দেখছি দেখে তিনি তো হেসেই আকুল। জিজ্ঞাসা করলেন,—"দাদার আবার ও-বিদ্যেও আছে না কি?" সার্টিফিকেট দিলেন স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী—"না গো; দাদা যা'-যা' বলেছেন সব ঠিক। তুমি হাসছ কি?"

উকিল ভায়া বল্লেন—"তা' হলে আমার হাতটাও একবার দেখে দিতে আজ্ঞা হোক।"

আমি স্বামী ও স্ত্রীর দু'খানি হাত পাশাপাশি রেখে গভীর গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তারপর আস্তে আস্তে বললুম—"কিছু মনে করো না ভাই। ওকালতিতে তোমার নাম আছে বটে; কিন্তু এই দেখ বুদ্ধির-রেখা। বৌ-ঠাক্রুণ তোমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমতী। আর তুমি যে করে খাচ্ছ, তা তাঁরই ভাগ্যের জোরে।"

প্রচণ্ড হাস্যধ্বনির মধ্যে সামুদ্রিক বিদ্যাচর্চ্চা শেষ হয়ে গেলো; আর আরম্ভ হলো চা-পান। উকিল ভায়াটির ঝোঁক নৈষ্ঠিক অসহযোগের দিকে, যদিও তিনি আদালত ছাড়েন নি, কিন্তু আমাকে তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করতে বেশী বেগ পেতে হলো না। সামুদ্রিক-বিদ্যার জোরে যাঁর হাতের ভিতর প্রবল বুদ্ধির রেখা আর নেত্রীর রেখা আবিষ্কার করেছিলুম, এবারে অগ্রণী হলেন তিনি স্বয়ং। সামুদ্রিক-বিদ্যার সঙ্গে স্বরাজ্য দলের প্রপাগাণ্ডার গভীর সংযোগ দেখে আমি বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করলুম।

* * *

ইতিমধ্যে নারী-সভায় বক্তৃতা শেষ করে উৎফুল্ল নয়নে হাজির হলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। বৌ-ঠাক্রুণ সুভাষের চা-প্রীতির কথা জানতেন। বক্তৃতা-ক্লান্ত সুভাষের জন্যে বড় একটা টাম্বলারে চা আনবার জন্যে তিনি রান্নাঘরের

দিকে ছুটলেন। আমি সুভাষকে বললুম—"সেনাপতি! বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করো। নারী-বাহিনীর সংবাদ কি?"

সুভাষ সানন্দে মহিলা-সভার বিবরণ দিতে লাগলো। কি তাঁদের আগ্রহ! কি তাঁদের স্বদেশ-প্রেম! কি তাঁদের নিষ্ঠা!—ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই নাকি নিঃশব্দে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"হাঁ কোরে তাঁরা তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন নি?"

সুভাষ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তার মানে?"

আমি বললুম, "মানে আর কিছু নয়। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, তাঁরা বক্তৃতা শুনতেও আসেন নি, আর কোন্ দলের কি প্রোগ্রাম তা' জান্‌বার জন্যে তাঁদের বিশেষ মাথা-ব্যথাও নেই, তাঁরা এসেছিলেন শুধু তোমাকে দেখতে, আর তোমার মুখের কথা শুনতে। আমি তোমার সঙ্গে মহিলা-সভায় যাই নি কেন জান? তোমার চাঁদমুখের পাশে আমার এই ভোঁদা মুখখানা থাকলে অর্দ্ধেক effect নষ্ট হয়ে যেত। তুমি মহিলাদের মাঝখানে স্বরাজ্য দলের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা না করে যদি উল্টো কিছু ব্যাখ্যা করতে, তা' হলেও আমার মনে হয় মহিলারা তাই মেনে নিতে ইতস্ততঃ করতেন না। এই বিষয়ে তাঁরা বিষম উদার!"

গৃহস্বামী বন্ধুটি হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলেন। সুভাষ হাসবে কি রাগবে তাই স্থির করার চেষ্টা করছে; এমন সময়

এক প্রকাণ্ড টাম্বলারে চা নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের অতিথি-বৎসলা গৃহকর্ত্রী।

চা পেয়ে সুভাষ আর ক্রুদ্ধ হবার সময় পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি নিতান্ত ভাল মানুষের মতো বলে উঠলাম—"জানেন, বৌ-ঠাক্‌রুণ! সুভাষবাবুর মহিলা-মিটিং খুব successful হয়েছে। সুভাষবাবুর মুখে তো আর আপনাদের এখানকার মহিলাদের সুখ্যাতি ধরছে না। সুভাষবাবুর যুক্তি নাকি তাঁরা শোনবার আগেই মেনে নিয়েছেন।"

সুভাষ চায়ের টামব্লার থেকে মুখ তুলে একবার কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে চেয়ে দেখলো। বৌ-ঠাক্‌রুণের অধর-প্রান্তে একটা অস্ফুট হাসির রেখা মিলিয়ে গেল।

* * *

শুনলাম তার পরদিন বৌ ঠাক্‌রুণ মহিলা-সভায় স্বরাজ্য দলের প্রোগ্রাম অনুমোদন করে একটা প্রস্তাব করেছিলেন, আর তা' বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। আমাদের মৈমনসিংহ-বিজয়ের প্রথম অধ্যায় শেষ হলো। দেখলুম—বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে যা' বলেছিলেন তা' একেবারে খাঁটি কথা—চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়!

দুঃখের বিষয়—চাঁদ নিজের জয়ের কারণ নিজেই জানে না।

ফাল্গুন, ১৩৫২

॥ ৩ ॥

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐ আন্দোলনের মধ্যে; কিন্তু চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পর মহাত্মাজী যখন ঐ আন্দোলন থামিয়ে দিলেন, তখন দেখতে পাওয়া গেল যে, দেশের মধ্যে ক্রমশঃ একটা উৎসাহ-ভঙ্গ জনিত অবসাদ এসে পড়েছে। ন্যাশনাল স্কুল-কলেজের বেঞ্চিগুলো খালি পড়ে রইল। ছেলেরা আস্তে আস্তে আবার তাদের পুরনো স্কুল-কলেজে ফিরে যেতে লাগলো। উকিল-মোক্তারেরা আবার ধড়াচূড়ো বেঁধে আদালতে ফিরে গিয়ে ভাঙ্গা প্রাকটিস জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে সব রায়বাহাদুরের দল তাড়া খেয়েও উপাধি বর্জ্জন করেন নি, তাঁরা অতি বিজ্ঞ ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন—"ওসব ঢের দেখেছি হে, ঢের দেখেছি! আমরা আগে থেকেই জানতুম ও-সব কিছুই হবে না। মাঝে থেকে সায়েব-সুবোকে চটিয়ে ছেলেগুলোর চাকরী-বাকরীর দফা ঘোলা হয়ে গেল।" যাঁরা খদ্দর পরতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার মিলের ধুতি পরতে সুরু করলেন। মাকড়সা ঘরের কোণে চরকায় সুতো কাটতে লাগলো।

অবসাদগ্রস্ত লোকের মনে আবার আশা আর উৎসাহ

ফিরিয়ে আনবার জন্যে দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্য দল গড়লেন। শান্ত ভাবে চরকা কেটে বা শুধু ঐ রকম গঠনমূলক কাজ করে সারা দেশকে যে তাড়াতাড়ি আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা যাবে, এটা তিনি মনে করতেন না। তার চেয়ে দেশে মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি যে সমস্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো যদি দখল করা যায় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাগুলো দখল করে বিদেশী শাসনকর্ত্তা আর তাঁদের স্বদেশী বন্ধুরা মিলে দেশে যে দু'-ইয়ার্কির (Dyarchy) সৃষ্টি করেছেন, সেটা যদি ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তা' হলে দেশের লোক বুঝতে পারবে যে গড়নের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গনের দরকার। দেশে একটা বিপ্লবী আবহাওয়া তা' থেকে সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর আরও একটা ধারণা ছিল যে, বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে যদি ঘায়েল করতে হয়, তা' হলে যাঁরা প্রধানতঃ কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক, শুধু সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যেও তা' হবে না। দেশের কৃষক, বিশেষ করে শ্রমিকদের সাহায্য দরকার।

এই দু'-ইয়ার্কি ভাঙ্গা বা পৃথক্ শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করা নৈষ্ঠিক অসহযোগীরা বেশ সুনজরে দেখতেন না। সকলেই কংগ্রেসের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিক—এইটাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। শ্রমিক বা কৃষকেরা নিজেদের শ্রেণীগত অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যে পৃথক্ ভাবে সংঘবদ্ধ হোক—এটা তাঁরা পছন্দ

করতেন না। তাঁরা মনে করতেন এ থেকে শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়ে জাতীয় আন্দোলন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে।

কিন্তু দেশবন্ধুর ধারণা ছিল একটু অন্যরকমের। রাষ্ট্রীয় শক্তি যদি শুধু মধ্যবিত্ত বা ধনিক-শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, তা' হলে যে দেশের মঙ্গল হবে, তা' তিনি মনে করতেন না। এমন কি, ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, দেশের শাসন-শক্তি যদি কখনও শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, তা' হলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লড়াই করে তিনি তা' কেড়ে নিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, এবং সুভাষচন্দ্রও সেই একই কারণে রাষ্ট্রীয় মহাসভা (National Congress) ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আরও একটা লক্ষ্য ছিল, সামরিক কায়দার একটা কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করা। বলাবাহুল্য, নৈষ্ঠিক অসহযোগীদের যে ভগ্নাবশেষ বাংলা দেশে ছিল—তাঁরা এসমস্ত কিছুই পছন্দ করতেন না। তাঁদের কেউ বলতেন—স্বরাজ্য দল প্রচ্ছন্ন মডারেটদের দল; কেউ বলতেন—ওদের অহিংসার উপর তেমন আস্থা নেই। অতএব কংগ্রেসী মহলে ওদের অপাংক্তেয় করে রাখা উচিত।

যতদিন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর আশ্রয়ে সুভাষচন্দ্রের কাজ করবার খুব সুবিধা ছিল। তাঁর পরিশ্রম করার শক্তি ছিল অসাধারণ। কলকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে তাঁকে খাটতে হতো সমস্ত দিন। কোন খুঁটি-নাটি তাঁর চক্ষু এড়াতে পারতো না। সব কর্ম্মচারীদের একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো। ধাঙ্গড়-মেথররা পর্য্যন্ত কাজ করছে কি ফাঁকি দিচ্ছে তা' তদারক করবার জন্যে man-hole-এ নেমে পড়তেও তাঁর আটকাতো না।

বাংলা দেশের পুরানো বিপ্লবী দলের মধ্যে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই স্বরাজ্য দলের ভিতর এসে পড়েছিলেন। তাঁদের ভিতরকার পুরানো দলাদলির ভাব লোপ না পেলেও তাঁদের সকলেরই টাঁক ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর; আর তাঁরা মনে করতেন যে, সুভাষকে নিজেদের দলে টানতে পারলেই বাংলা দেশের তথা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির উপর তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। সুভাষের চেষ্টা ছিল কোন বিশেষ দলে যোগ না দিয়ে সব দলগুলোকে স্বরাজ্য দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেশকে সংঘবদ্ধ করার কাজে লাগানো। এদিকে গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। একে তো স্বরাজ্য দলের ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতি দখল করা তাঁরা সুনজরে দেখতেন না, তার উপর ভাবলেন যে, স্বরাজ্য দলের

ভিতরে ঢুকে পুরানো বিপ্লবপন্থীরা যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করে, তা' হলে হয়ত দেশে একটা ভীষণ গণ্ডগোল বেধে যাবে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা বিপ্লবীদের ভিতর থেকে বেছে-বেছে কতকগুলো লোককে ১৮১৮ সালের তিন ধারায় ফেলে জেলে পুরলেন। আমিও তাঁদের মধ্যে পড়ে গেলুম।

আমরা ভাবলুম, সুভাষচন্দ্রের উপর সরকার বাহাদুরের শনির দৃষ্টি সম্ভবতঃ তখনও পূরোমাত্রায় পড়ে নি। কিন্তু সেই আশায় ছাই পড়তে বেশী দিন লাগল না। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁরা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র ও আরও দুই-একজন স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীকে টেনে নিয়ে জেলে পুরলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন জেল থেকে ফিরে এলেন তখন দেশবন্ধু পরলোক। দেশবন্ধুর পাঁচজন বিশিষ্ট সহকর্ম্মী স্থির করে রেখেছিলেন যে, দেশবন্ধুর পর তাঁরাই বাংলা দেশে স্বরাজ্য দল পরিচালনার ভার নেবেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দেশবন্ধুর অন্যতম সহকর্ম্মী হলেও, এঁরা সেনগুপ্তকে একটু দূরে রেখেই চলতেন। দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর কে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করবেন তা' স্থির করবার ভার পড়লো মহাত্মাজীর উপর; আর মহাত্মাজী কলকাতায় এসে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন যে, শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি নয়, কলকাতা করপোরেশন ও বাংলা ব্যবস্থাপক-সভায় কংগ্রেসী

দলকে পরিচালনা করবার ভার থাকবে সেনগুপ্তের উপর। স্বরাজ্য দলের যে বিশিষ্ট পাঁচজন নেতার কথা পূর্ব্বে বলেছি, এবং যাঁরা সে সময় Big Five নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁরা এ ব্যবস্থায় বেশ তুষ্ট হন নি; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে কোন রকম বিরোধিতাও করেন নি।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও বাংলা দেশ ক্রমশঃ তীব্র দলাদলিতে ভরে গেল। নৈষ্ঠিক অসহযোগীরা অনেকটা হীনবল হয়ে পড়ে ছিলেন বটে, কিন্তু স্বরাজ্য দলটি ভাগ হয়ে গেল সেনগুপ্ত সাহেবের দলে আর Big Five এর দলে। তার উপর বীরেন্দ্র শাসমলের নেতৃত্বে আরও একটা ছোট্ট দল গড়ে উঠেছিল, যাঁরা মনে করতেন যে, দেশবন্ধুর অবর্ত্তমানে শাসমলের উপরই বাংলার নেতৃত্বভার পড়া উচিত ছিল।

জেল থেকে খালাস পাবার পর সুভাষচন্দ্রকে ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। কোন উপদলের নেতাদেরই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না; সুতরাং কোন দলের সঙ্গেই তাঁর ষোল আনা মনের মিল ছিল না। কিন্তু পারিবারিক ও অন্যবিধ কারণে সুভাষকে প্রথমতঃ Big Fiveদের কাছ ঘেঁষেই থাকতে হতো। এঁদের সাহায্যেই তিনি আবার স্বরাজ্য দলের ছিন্নসূত্রগুলো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। ক'লকাতা করপোরেশন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতি

প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে এক আদর্শ-প্রণোদিত হয়ে এক নেতৃত্বাধীনে কাজ করতে পারে, সে চেষ্টা করতে গিয়ে সুভাষকে পদে পদে বাধা পেতে হয়েছিল। তাঁর অনেক পুরানো বন্ধু ও সহকর্ম্মী তাঁকে অযথা ক্ষমতাপিপাসু মনে করে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন। এ সন্দেহও তাঁর মনে হয়েছিল যে, পুরানো বিপ্লবী দলগুলোর যে সমস্ত কর্ম্মী তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আপন আপন উপদলেরই অনুগত। শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই যে তাঁরা বাহ্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন, এ সন্দেহ সুভাষের মনে উঠেছিল। সেই জন্য তিনি চেষ্টা করে-ছিলেন নূতন নূতন ছেলেদের নিয়ে একটি নিজস্ব দল গড়ে তোলবার।

এই সমস্ত গণ্ডগোলে তাঁর মনটা বিশেষ ভাবে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর যখন তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়ে দেখলেন যে, নিখিল ভারতীয় নেতারাও তাঁর উপর বিরূপ, তখন তাঁর মন তিক্ততায় ভরে উঠলো। এ ধারণা তাঁর মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা মুখে স্বাধীনতার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে যে রাস্তা ধরে চলেছেন, তাতে দিনকতক পরে ইংরেজের সঙ্গে একটা রফা করা ছাড়া আর তাঁদের গত্যন্তর থাকবে না। অথচ দেশের সাধারণ যুবকসম্প্রদায়ের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ। দেশ ছেড়ে গিয়ে একটা কিছু সুবিধা করা যায়

কি না তা' পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা সেই সময় থেকেই তাঁর মনে উঠতে আরম্ভ করেছিল।

*　　　　*　　　　*

যাঁরা শব-সাধনায় সিদ্ধ তাঁরা বলেন যে, প্রথম প্রহরের পর ভূত, প্রেত, পিশাচ এসে সাধককে ভয় দেখায়। সে ভয়ে যদি তিনি সাধনা থেকে বিচলিত না হন, তো দ্বিতীয় প্রহরে মায়াবিনীরা এসে তাঁর কাছে আত্মীয়-স্বজনের রূপ ধরে মায়া-কান্না কাঁদতে থাকে। তাতেও যদি তাঁর মন না টলে, তো তৃতীয় প্রহরে মহামায়া মহান্ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন। মুক্তি শুধু তাঁরই লভ্য, যিনি এই তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। সুভাষচন্দ্র প্রথম দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শেষ পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। যদি তিনি ইহলোকে থাকেন, তা' হলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের মুক্তিদাতারূপে আবার জগতের সামনে আত্ম-প্রকাশ করেন।

চৈত্র, ১৩৫২

॥ ৪ ॥

এদেশে বিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থেকে সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, জলে বাস করে যেমন কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, ইংরেজাধিকৃত দেশে বাস করে তেমনি ইংরেজী-শাসন ধ্বংস করা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ সন্দেহও তাঁর মনে জেগেছিল যে, কংগ্রেসের যে সমস্ত নেতা এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার ভার নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পুরানো মডারেট দলের কর্ম্মপন্থার পার্থক্য থাকলেও আদর্শের খুব বেশী পার্থক্য নেই। সেকালের মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রধান সম্বল ছিল আবেদন ও নিবেদন। তাঁরা মনে করতেন যে, ইংরেজকে জব্দ করবার কোন অস্ত্রই যখন তাঁদের হাতে নেই, তখন moral pressure দিয়ে অর্থাৎ বড় বড় তত্ত্বকথা আওড়িয়ে ইংরেজের মনে সুবুদ্ধি উদ্রেক করবার চেষ্টা করাই স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এই moral pressure প্রয়োগ করবার পরও যদি ইংরেজের বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে থাকে, তা' হলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করে বিশুদ্ধ নৈতিক চাপকে অর্থনৈতিক চাপে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। এর ফলে একদিন না একদিন স্বায়ত্তশাসন আমাদের হাতের

মুঠোর ভেতর এসে পড়বে এবং এদেশের লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

স্বদেশী যুগে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে একদল লোক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না; এবং কংগ্রেসের নামজাদা নেতাদের মধ্যে অধিকাংশ এঁদের কার্য্যকলাপ বেশ সুনজরে দেখতেন না। কাজেই কংগ্রেসী-আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার আলোচনায় এঁদের উল্লেখ না করাই ভাল।

১৯২০ সালে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর হাতে গিয়ে পড়ল, তখন কংগ্রেসের আদর্শ হ'ল স্বরাজ লাভ; কিন্তু স্বরাজ অর্থে ঠিক যে কি বুঝতে হবে তা' কেউ স্পষ্ট করে বলতে চাইতেন না। চেপে ধরলে তাঁরা বলতেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের শাসনভার আমাদের হাতে তুলে দেন, তা' হলে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্তশাসন পেলেই আমরা সন্তুষ্ট হব এবং ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। আর যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সে শুভবুদ্ধি না হয়, তা' হলে বাধ্য হয়েই আমাদের ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের বাইরে যেতে হবে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি সব কংগ্রেসী নেতাই এই মতাবলম্বী ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মনে করতেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের আদর্শ উচ্চতর।

১৯২০ সালের পরে কংগ্রেসী নেতারা আবেদন-নিবেদনের পন্থা পরিত্যাগ করে স্থির করলেন যে, এদেশের বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এদেশের লোক যদি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে তা' হলে শাসনকর্ত্তারা নৈবেদ্যের মাথায় মোণ্ডার মতো ধুপ করে নীচে গড়িয়ে পড়বেন। ধীরে ধীরে কেমন করে এই সংস্রব পরিত্যাগ করতে হবে, এবং সারা দেশে বিদেশী শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসী-শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসী কেন্দ্র থেকে লোকের মধ্যে সেই শিক্ষা প্রচারিত হতে লাগল। পাছে কোন অজুহাতে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি ভেঙ্গে দেয়, সেজন্য দেশের লোককে বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়া হতে লাগল, যেন কোন কারণেই তারা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত না হয়।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌কে সুভাষচন্দ্র কস্মিন্‌কালেও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তবু তিনি মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত এই অসহযোগ-আন্দোলনের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে আর কিছু হোক আর নাই হোক দেশের লোকে-শত্রু মিত্র চিনতে পারবে এবং দেশের লোকের মনে যে জড়তা ও উদ্যমহীনতা এসে পড়েছে তা' কতকটা দূরীভূত হবে।

অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে দেশের জড়তা অনেকটা

দূর হল বটে; কিন্তু চৌরিচৌরার পরে দেখা গেল যে, নেতৃবৃন্দ যে পথে দেশের উত্তেজনা ও উদ্যম প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন, দেশের জনসাধারণ ঠিক সে পথ না ধরে একটু ভিন্ন পথে চলতে আরম্ভ করেছে। অহিংসার প্রভাবে শত্রুর মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন প্রভৃতি যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের উপর মহাত্মাজী এই আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের বোধগম্য হয় নি। কাজেই চৌরিচৌরার পর মহাত্মাজী যখন অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, তখন দেশের লোক আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল।

এই নিরুৎসাহের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য কংগ্রেস সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স এনকোয়েরি কমিটি বসালেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মগধ, পাঞ্চাল পরিভ্রমণ করে কমিটি স্থির করলেন যে, দেশের জনসাধারণ এখনও আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় নি; অর্থাৎ অহিংস-ভাবে কিরূপে অত্যাচার দমন করতে পারা যায়, তা-ই তারা এখনও শিখে উঠতে পারে নি। কাজেই কমিটি স্থির করলেন যে, তাড়াতাড়ি আইনভঙ্গের চেষ্টা না করে অন্য উপায়ে দেশের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টা করাই ভাল। ব্যবস্থাপক-সভাগুলো দখল করে যদি দ্বৈতশাসন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা যায়, তা' হলে দেশের লোকে আবার নূতন

আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে; এবং নির্ব্বাচনের সময় দেশে যে প্রচারকার্য্য চলবে তার ফলে ভবিষ্যতে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করারও হয়ত সুবিধা হতে পারে। এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করে কংগ্রেসের ভিতর একটি নূতন দল গড়ে উঠল; এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হলেন এই দলের নেতা।

চৌরিচৌরার পর অসহযোগ-আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বা সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। অহিংসার উপর মহাত্মাজী যতটা জোর দিতেন, দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্র ততটা' দিতেন না। দেশবন্ধুর সম্ভবতঃ ধারণা ছিল যে, ব্যবস্থাপক-সভাগুলো ভেঙ্গে দিয়েই হোক আর দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি করেই হোক, বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র যদি অচল করে দেওয়া যায়, তা' হলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে ঠিক ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ না হোক, তার কাছাকাছি একটা কিছু আদায় করা যেতে পারে। স্বরাজ্য দলের ভেতর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হলেও মহাত্মা গান্ধীর বা দেশবন্ধুর কর্ম্মপন্থার উপর তাঁর ষোল আনা আস্থা ছিল না। পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁর কাম্য। নৈষ্ঠিক অসহযোগীদের গঠনমূলক কর্ম্ম-পন্থার প্রভাবে দেশের লোকে যে কখনও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ করবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। ব্যবস্থাপক-সভাগুলো ভেঙ্গে দিলেই যে বিদেশী শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়বে, এও তিনি মনে

করতেন না। কোন্ আন্দোলনে কতটুকু ফল পাওয়া যায়, তা পরীক্ষা করে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

রাউণ্ড-টেবিলের বৈঠক বসবার পর হতে তাঁর মনে এই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হল যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করে নিলেও হয়ত অবশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা আপোষ করে স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপন করে ফেলবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হতে কেউ রাউণ্ড-টেবিলের বৈঠকে যোগ দিন, এটা সুভাষচন্দ্র চাইতেন না। স্বাধীনতা লাভের জন্য একদিন না একদিন যে অহিংসার সীমা অতিক্রম করে প্রকৃত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবৃন্দের হাত থেকে পরিচালনা ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য; এবং সেই লক্ষ্য অনুসরণ করেই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হতে চেয়েছিলেন।

কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবৃন্দ যে তাঁর কার্য্য-কলাপ সন্দেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছেন, তা' বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি; এবং তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হবার পর মহাত্মাজী যখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে পদচ্যুত করলেন, তখন কংগ্রেসের ভিতর যে দু'টি ভিন্ন আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চলছিল, এ

কথা বুঝতে আর কারও বাকী রইল না। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের ভেতরকার সমস্ত বামপন্থী দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃই তিনি আবিষ্কার করতে লাগলেন যে, মৃত মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রেতাত্মাগুলো যতদিন কংগ্রেসের ভেতরকার তথাকথিত অহিংসবাদী প্রাচীন নেতৃবৃন্দের স্কন্ধে ভর করে থাকবে, ততদিন কংগ্রেসের প্রকৃত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার কোনই সম্ভাবনাই নেই।

তখন তাঁর মনে হল—কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় করে লাভ কি? একদিকে প্রবল শত্রু গবর্ণমেণ্ট সহস্র চক্ষু বিস্তার করে তাঁর প্রত্যেক কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, অপরদিকে আধা-মডারেট নেতৃবৃন্দ তাঁকে—After all, he is not an enemy of the country—এই সার্টিফিকেট দিয়ে ধন্য করবার চেষ্টা করছেন! স্বদেশপ্রেম যে কারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং দেশকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পন্থা দেখাবার ভার যে ভগবান্ কোন নেতৃবিশেষের হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন নি—একথা কি দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করা যায় না?

বিদেশে যাবার সংকল্প তখন তাঁর মাথায় গজাল। একদিন দেশের লোক চমকিত হয়ে শুনল যে, ভারতবর্ষের বাইরে একটা স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;

এবং সহস্র সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে সুভাষচন্দ্র এদেশের বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করবার আয়োজন করছেন।

* * *

সুভাষচন্দ্রের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর প্রশ্ন জেগে উঠে—সত্যই কি ব্যর্থ হয়েছে? তাঁর 'জয়হিন্দ' মন্ত্র যে আজ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, এ কি নিরর্থক?

* * *

মহাত্মাজী বলেছেন, সুভাষচন্দ্র যুদ্ধে বিজয়ী হলেও দেশ স্বাধীনতা লাভ করত না; আর স্বাধীনতা লাভ করলেও সে স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত না!!

* * *

হবেও বা! রামধনের ইচ্ছা রামধনই জানেন!

বৈশাখ, ১৩৫৩